আনন্দমার্গ

(প্রারম্ভিক দর্শন)

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

© ১৯৫৬ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস : আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর , পোঃ-
বাগলতা ,

যোগাযোগ অফিস : ৫২৭ ভি . আই . পি . নগর

কোলকাতা -৭০০ ১০০

প্রথম সংস্করণ : আনন্দ পূর্ণিমা , ১৯৫৬

দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণী পূর্ণিমা , ১৯৫৬

তৃতীয় সংস্করণ : আনন্দ পূর্ণিমা , ১৯৬১

চতুর্থ সংস্করণ : আনন্দ পূর্ণিমা , ১৯৬৪

পঞ্চম সংস্করণ : ফাল্গুনী পূর্ণিমা , ১৯৭০ :

ষষ্ঠ সংস্করণ : শ্রাবণী পূর্ণিমা : ১৯৯১

সপ্তম মুদ্রাঙ্কন : জানুয়ারী , ২০১১

প্রকাশক : আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত আনন্দমার্গ
প্রকাশন বিভাগ ৫২৭ ভি . আই . পি .
নগর কোলকাতা –৭০০ ১০০

মুদ্রাকর : শ্রীকালী আর্ট প্রেস ২০৯ সি , বিধান সরণী কোলকাতা
৭০০০০৬

ISBN 978-81-7252-259-9

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র

চরম নির্দেশ

“ যে দু’ বেলা নিয়মিত রূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগবেই জাগবে ও মুক্তি সে পাবেই পাবে — তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু'বেলা সাধনা করতেই হবে। ইহাই পরমপুরুষের নির্দেশ । যম - নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না — তাই যম - নিয়ম মানাও পরমপুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হল কোটি কোটি বৎসর পশু - জীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরমপুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে , তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎ পথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ । ”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প	ফ	ব	ভ	ম
प	फ	ब	भ	म
Pa	pha	ba	bha	ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato'haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n

ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে

যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই । আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই ।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয় । প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে ।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

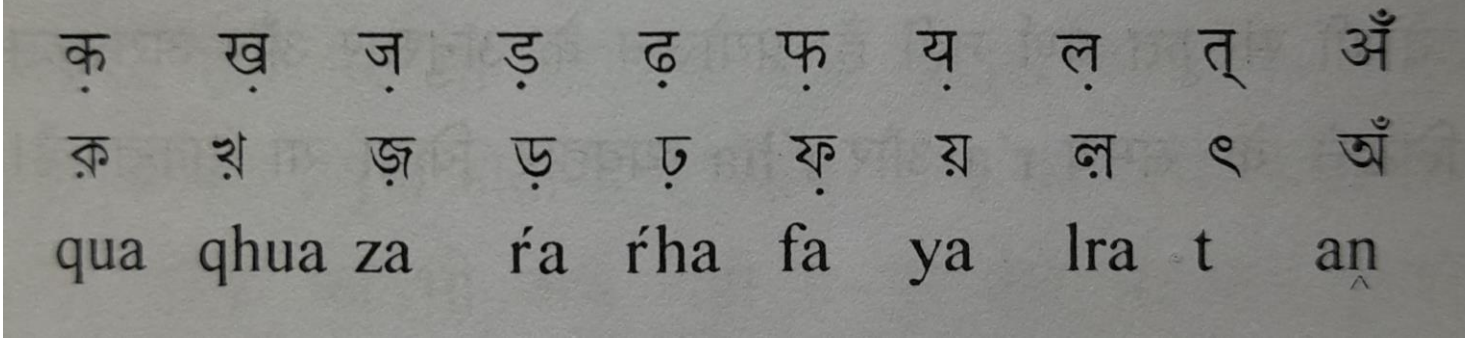

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

সূচীপত্র

■ ধর্ম কী ?

■ বিভু সত্তা কী ?

■ জগৎ কী ?

■ আমি কে বা কী ?

■ জগৎ ও ভূমাসত্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ?

■ এ জগতে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত ?

■ মানুষের লক্ষ্য কী

■ আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও তার প্রয়োজনীয়তা ...

■ মানুষ সাধনাকে ভয় করে কেন ?

সাধনা না করে মুক্তি লাভ করতে পারে না

তিনিই কেবল গুরু হতে পারেন

সদ্গুরুর সন্ধানে

ধর্ম কী ?

ক্রমবিবর্তনের চরম পরিণতি মানুষ অণুচৈতন্যের ব্যাপক স্ফূর্তি - নিবন্ধন অন্যান্য জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । মানুষ তার এই স্ফূর্ত চৈতন্যের সাহায্যে ভাল - মন্দের পার্থক্য নির্ধারণে তথা বিপন্মুক্তির পথ অন্বেষণে সক্ষম । কোন জীবই দুঃখদুর্দশাক্লিষ্ট জীবন চায় না । বস্তুতঃ মানুষের স্বভাবই হচ্ছে আনন্দের অন্বেষণ করা । এখন দেখা যাক্ এই আনন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মানুষ কী করে , আর তাতে তা ’ লব্ধ হয় কি না । আনন্দের অন্বেষণে মানুষ প্রথমতঃ পার্থিব ভোগের দিকেই আকৃষ্ট হয় — এষণার নিবৃত্তির জন্যে সে ধন আহরণ করে , ক্ষমতা - প্রতিপত্তি অর্জনে তৎপর হয় ; কিন্তু এ সকল জিনিস তাকে আনন্দ দিতে পারে না । যার আজ একশত টাকা আছে সে চায় লক্ষ টাকার মালিক হতে । চাহিদার এরূপ ক্রমবর্ধমান গতি অব্যাহতই থেকে যায় । আবার যে আজ নিজের জেলায় প্রতিপত্তি অর্জন করেছে সে চায় প্রদেশজোড়া প্রতিপত্তি , অনুরূপভাবে প্রাদেশিক নেতারা চান রাষ্ট্রনেতা হতে ,

আর রাষ্ট্রনেতা হবার পরেও তাঁদের মনে বিশ্বনেতা হবার বাসনা জেগে বসে । অর্থাৎ সীমিত সম্পদ , মান - যশ , ক্ষমতা - প্রতিপত্তি এগুলো মানুষের বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না , বরং ভোগের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়েই দেয় , আর এতে করে মানুষের অনন্ত ক্ষুধা অতৃপ্তই থেকে যায় ।

প্রাপ্তির ঐশ্বর্য যতই মহান হোক্ না কেন , অনন্ত সুখের পিয়াসী মানব - মনকে তা পরিতৃপ্ত করতে পারে না । যারা ধন - মান , খ্যাতি যশ প্রভৃতির পশ্চাতে ধাবিত হয় তারা এগুলো অনন্ত পরিমাণে না পাওয়া পর্যন্ত কখনও তৃপ্ত হতে পারে না । কিন্তু গোটা পৃথিবীটাই একটা সীমিত সত্তা , তাই তৎ - সাপেক্ষ পার্থিব জিনিস অবশ্যই সীমিত । এগুলো অনন্ত পরিমাণে আহরণ করাও সম্ভব নয় । সুতরাং পার্থিব মহান প্রাপ্তি তা ’ যদি ভূমণ্ডলও হয় তাহলেও অনন্ত ও শাশ্বত নয় । তাহলে সেই শাশ্বত সত্তাটি কী যা মানুষকে চিরন্তন সুখ দিতে পারে ?

ভূমা সত্তাই কেবল অনন্ত ও শাশ্বত , আর তাঁর উপলব্ধিতেই মানুষের অনন্ত ক্ষুধার পরমা নিবৃত্তি সম্ভব। নশ্বর পার্থিব মানৈশ্বর্য , ক্ষমতাপ্রাপ্তি মানুষকে এই স্থির সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে সান্ত সীমিত পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার অনন্ত সুখলাভের চিরন্তন স্পৃহার শাশ্বতী তৃপ্তি হতে পারে না — হতে পারে কেবল সেই বিভূ সত্তা ব্রহ্মের উপলব্ধিতে। বস্তুতঃ মানুষের অনন্ত ভোগ বাসনার পশ্চাতে এই ব্রহ্মোপলব্ধির বাসনাই প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। অতএব ব্রহ্ম - সম্প্রাপ্তিই মানুষের ধর্ম , আর জীবমাত্রেরও তা - ই স্বভাব।

‘ ধর্ম ’ শব্দের অর্থ হ’ল সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হ’ল ‘ নেচার ’ , characteristic বা property . আগুনের ধর্ম বা স্বভাব দহন করা। আগুন ও তার ধর্ম এ দু'টো জিনিস যেমন অবিচ্ছেদ্য , মানুষ ও তার ধর্ম ব্রহ্মানুসন্ধিৎসা — এও ঠিক তেমন ধারা জিনিস।

চৈতন্যের স্ফুটতর অভিব্যক্তিতেই মানুষের মধ্যেকার দেবত্বের মান সূচিত হয়ে থাকে , সৃষ্টির ক্রমোন্নতির ধারায় পশুজীবন থেকে মানব জীবনের বিকাশ ঘটে থাকে , আর তাই মানব জীবনে বৃত্তির দ্বিমুখী গতি পরিদৃষ্ট হয় । জড়াভিমুখী গতি তাকে পশুত্বের দিকে টেনে নিয়ে যায় , আর তদ্বিপরীত সূক্ষ্মধর্মী গতিই তাকে পশুত্বের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয় । পশুজীবনে পশুত্বের ব্যাপক বিকাশ দৃষ্ট হয় , আর চৈতন্যের স্ফুটতর অভিব্যক্তি - নিবন্ধন মনুষ্য - জীবনে বিচার বিবেচনারও মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় । পশুত্বের প্রাবল্যে মানুষ পানাহারাদি যে সকল স্থূল ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয় তারা কখনো তার অনন্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না । পশুদের ভোগ - স্পৃহা অনন্ত নয় বলে ’ তারা এ সকল সীমিত ভোগ্যে পরিতৃপ্ত হয়– অপর্যাপ্ত ভোগোপাদান থেকেও পশুরা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করে না । কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় মানুষ নিশ্চয় তা করে না । এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে পশুদের ভোগাকাঙ্ক্ষা সীমিত , কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা ’ অনন্ত । উভয়ক্ষেত্রেই পশুত্বকে কেন্দ্র করেই ভোগাভিমুখী গতির অভিব্যক্তি হয়ে থাকে । মানুষের বিকশিত চৈতন্যই এতদুভয়ের

মধ্যে এই বিভেদের সৃষ্টি করে। এই বিকশিত চৈতন্য - সাপেক্ষ অনন্ত সুখ প্রাপ্তির অনন্ত ক্ষুধা নশ্বর সীমিত পার্থিব সুখৈশ্বর্য - ক্ষমতা - প্রতিপত্তি প্রভৃতিতে নিবৃত্ত না হয়ে ’ তাকে উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দের দিকেই আকৃষ্ট করতে থাকে।

মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও বিবেকের মধ্যে সর্বদাই সংঘর্ষ হয়ে চলেছে। পশুত্ব তাকে প্রপঞ্চাত্মক ভোগে উৎসাহিত করে আর অতৃপ্ত ও জাগ্রত বিবেক তার ব্রহ্মাভিমুখী গতি অব্যাহত রাখে। ক্ষমতা প্রতিপত্তি দ্বারা আহৃত ভোগ্য - সামগ্রী যদি অসীম ও অনন্ত হ'ত তাহলে তারা অবশ্যই আনন্দাভিলাষী বিবেকের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসার অবসান ঘটাতে সক্ষম হত কিন্তু তারা তা নয় বলে নশ্বর পার্থিব ভোগের চরম মর্যাদাও মানুষের মনে শাশ্বতী শান্তির প্রতিষ্ঠা করে তাকে ভূমানন্দে অধিষ্ঠিত করতে পারে না।

চৈতন্যের স্ফূটতর অভিব্যক্তিই মানুষ ও পশুর পার্থক্য সূচিত করে। তাহলে এই চৈতন্যের সদ্ব্যবহার কি মানুষ মাত্রেরই একান্ত

করণীয় নয় ? তার চৈতন্য বা বিবেক যদি পশুত্বের আড়ালে প্রসুপ্তই থেকে যায় তাহলে তার আচরণ অবশ্যই পশুস্তরে নেৰে ' আসতে ৰাধ্য । বস্তুতঃ সে পশুরও অধম হয়ে পড়ে , কেননা অভিব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারী হয়েও সে তার সুযোগ গ্রহণ করে না । এরূপ ব্যষ্টি নিশ্চয়ই মনুষ্য নামের অযোগ্য — এরা মানবাধারে এক একটি পশুবিশেষ । চৈতন্যের ধর্মই হ'ল অখণ্ড সত্তা ব্রহ্মত্বের পানে ধাবিত হওয়া । অভিব্যক্ত চৈতন্যের প্রেরণাকে কার্যান্বিত করে যারা মনুষ্য নামের সার্থকতা বহন করে তারা অবশ্যই দেখবে যে তাদের সকলের লক্ষ্যই সেই এক অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্ম । ব্রহ্মসম্প্রাপ্তির এই এষণাই হ'ল মানুষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য , গুণ বা ধর্ম । ইচ্ছার পরিপূর্তিই হ'ল আনন্দ । ঈপ্সিত বস্তু না পেলে ' দুঃখের গ্লানিতে মানুষের মন ভরে ওঠে । স্ফুটতর চৈতন্যই মানুষকে পশুজীবনের গ্লানি থেকে অব্যাহতি দেয় ও ব্রহ্মানুশীলনে তৎপর করে , তাই ব্রহ্মসম্প্রাপ্তিতে বা তৎপ্রচেষ্টায় সংলগ্ন হয়েই মানুষ যথার্থ আনন্দ লাভ করে । এভাবে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে অনন্তকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি

করাই হ'ল বিশ্ব মতবাদ বা মানব - ধর্ম। কেবল এই ধর্মের অনুশীলনেই মানুষের শাশ্বত সুখ বা পরমা শান্তি লাভ সম্ভব। ব্রহ্মসম্প্রাপ্তিই যখন মানুষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম , তখন ব্রহ্ম আছে কি না তা অবশ্যই দেখে নেওয়া দরকার , কেননা যে জিনিসের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাকে লাভ করার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় , আর ব্রহ্ম যদি থাকে তবে তা কি এও আমাদের জানা দরকার।

আপাতদৃষ্টিতে স্থূল ইন্দ্রিয়কেই ব্যষ্টিবিশেষের যাবতীয় কার্যের কর্তা বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের সংখ্যা দশ। ব্যষ্টির সমগ্র কর্ম - প্রচেষ্টায় এদের কর্তারূপে দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এরা তা নয়। মনের নিষ্ক্রিয়তায় ইন্দ্রিয় নিজে কোন কর্মই সম্পন্ন করতে পারে মনই কর্ম সম্পাদন করে — ইন্দ্রিয়সমূহ তার বাহন মাত্র। ইন্দ্রিয়ের বাহকতায় মনে উদ্ভূত কর্মের ৰহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ততঃ পুস্তকপাঠ ক্রিয়াটা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনই করে থাকে — মনের নিষ্ক্রিয়তাবস্থায় চক্ষুরিন্দ্রিয় দেখতে পায় না

, যেমন অচেতন অবস্থায় চক্ষু উন্মুক্ত ও অবিকৃত থাকলেও মন থেকে অসংলগ্ন থাকে বলে তার স্বাভাবিক কার্য ব্যাহত হয়ে পড়ে । এই কারণেই অসাড়কারী ঔষধের প্রভাবে অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকলেও নিষ্ক্রিয় থাকে । এটা প্রায়ই দেখা যায় যে কোন বিশেষ ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে আমরা সম্মুখের ব্যষ্টিকেও লক্ষ্য করি না বা বন্ধুকেও চিনতে বিলম্ব করি । এর একমাত্র কারণ কর্মের যথার্থ কর্ত্তা মনের নিষ্ক্রিয়তা তথা ইন্দ্রিয়রূপ বাহনের অনবধানতা । এখন দেখা যাক্ কর্মের প্রকৃত কর্ত্তা মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কীভাবে কাজ করে । পুস্তক দেখা ক্রিয়াটা ইন্দ্রিয়ের বাহকতা - সাপেক্ষ মনের একটা ক্রিয়াবিশেষ । পুস্তক দেখা - কালে মন চক্ষুর সহায়তায় পুস্তকরূপ বস্তুটির আকৃতি গ্রহণ করে । অক্ষিপটে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি থেকে মনে গৃহীত এই আকৃতি একটু অন্য ধরনের জিনিস , কেননা মন চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায়ও ইচ্ছা করলেই পুস্তকের আকার ধারণ করতে পারে কিন্তু চক্ষু মনের নিষ্ক্রিয়তায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে । সুতরাং পুস্তক দেখা কালে মনেরই একটা অংশ পুস্তকাকার প্রাপ্ত হয় , আর মনের

সেই সংশ্লিষ্ট অংশকে বলে ‘ চিত্ত ' । চিত্ত পুস্তকের আকার ধারণ করলেও দর্শন - ক্রিয়া নিষ্পন্ন করবার জন্যে চিত্তাতিরিক্ত কোন সত্তা কাজ করে । মনের যে অংশ এই দর্শন - ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাকে বলা হয় ‘ অহংতত্ত্ব ’ । কিন্তু ‘ আমি ’ - র অস্তিত্ব অসিদ্ধ থাকলে ‘ আমি ’ - র পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় বলে চিত্ত ও অহংতত্ত্বের অতিরিক্ত সত্তার উপস্থিতিও অবশ্যই মেনে নিতে হবে । ‘ আমি ’ - র অস্তিত্ববোধক মনের এই তৃতীয় অংশ ‘ মহত্তত্ত্ব ' নামে পরিচিত । অস্তিত্ববোধ বা আত্মবোধ ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হ’তে পারে না । আর মহত্তত্ত্বই এই বোধ পরিস্ফুট করে । এই অংশত্রয়ের সামূহিক নামই মন বা অন্তঃকরণ , আর অংশত্রয় এককভাবে মনের অভিব্যক্তি মাত্র । এই মনের সাহায্যেই দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় যাকে রূপতন্মাত্রের মানস রূপায়ণ বলা যেতে পারে । ‘ তন্মাত্র ’ — একটা নোতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে , তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । ইন্দ্রিয়ের বাহকতায় স্থূল বস্তুর সূক্ষ্মরূপে মানস পটে গৃহীত হওয়াকেই ‘ তন্মাত্র ’ বলে । আরও বিশদভাবে বোঝাবার জন্যে বলতে হয় যে

চক্ষুযন্ত্রের সাহায্যে বস্তু দর্শনকালে রূপতন্মাত্রের (ভাবগ্রাহী চাক্ষুসী নাড়ীর স্পন্দন - সঞ্জাত সূক্ষ্ম বস্তুরূপ ধারণ) অবলম্বনেই মানসপটে বস্তুরূপ ধৃত হয় । কিন্তু চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় তথা অন্ধকারময় স্থানে স্পর্শের দ্বারাও মানুষ বস্তুর অনুভূতি লাভ করে । এস্থলে স্পর্শতন্মাত্র নামে অপর একটি তন্মাত্রের সাহায্যে বস্তুবোধ হ'ল । আবার দর্শন তথা স্পর্শনভূমি - বহির্ভূত স্থানে বস্তু নিক্ষিপ্ত হ'লে প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা বস্তু - বোধ হওয়া সম্ভব । অহংতত্ত্বের ইচ্ছাসাপেক্ষে চিত্ত তন্মাত্র সান্নিধ্য লাভ করে । দর্শনক্রিয়া তথা বস্তু নিরূপণ অহংতত্ত্বের ওপরই নির্ভর করে , কেননা চিত্ত নিজে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না । অহংতত্ত্ব বা মনের ক্রিয়াশীল অংশের বস্তুদর্শন - ইচ্ছায় চিত্ত দৃষ্টি - স্নায়ুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় — চক্ষু বস্তুর রূপতন্মাত্র গ্রহণ করে । পরিবেশ হ'তে ঘন সন্নিবিষ্ট তন্মাত্র তরঙ্গাকারে উত্থিত হয় ও অক্ষিপটের মাধ্যমে সতত প্রবাহিত হয়ে চিত্তভূমিতে ধাক্কা পৌঁছায় । এই সংঘর্ষের ফলে চিত্ত বস্তুরূপ ধারণ করে আর অহংতত্ত্ব তা দেখে । অনুরূপভাবে অহংতত্ত্ব যখন কোন কিছু শ্রবণ করতে চায় তখন

চিত্তকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে প্রেরণ করে ও শ্রবণেন্দ্রিয় স্থূল পরিবেশ থেকে শব্দতরঙ্গের বাহকতায় শব্দতন্মাত্র গ্রহণ করে থাকে। তন্মাত্র - সন্নিবিষ্টতায় চিত্ত নিজে শব্দে রূপান্তরিত হয় , আর অহংতত্ত্ব সেই শব্দ শোণে। অর্থাৎ অহংতত্ত্ব যা - ই চায় বা করে চিত্ত তারই রূপ পরিগ্রহ করে , আর তাই অহংতত্ত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন যাবতীয় কার্যের অভিপ্রকাশ চিত্ত - সাপেক্ষ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মন হচ্ছে চিত্ত , অহংতত্ত্ব তথা মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের এক সামবায়িক সৃষ্টি। অহংতত্ত্বের নির্দেশে চিত্ত বস্তুভাব প্রাপ্ত হয় আর অহংতত্ত্ব কেবল ক্রিয়া সম্পন্ন করে ’ যায়।

‘ আমি আছি ’ বোধের চেতনা সম্পন্ন মহত্ত্ব বা ৰুদ্ধিতত্ত্ব মানসভূমি থেকে উদ্ভূত হয়ে অহংতত্ত্ব ও চিত্তকে কার্যান্বিত করায়। অহংতত্ত্বের প্রভাবে চিত্ত বস্তুরূপ ধারণ করলেও এই অস্তিত্বৰোধক ‘ আমি ’ র অভাবে বস্তু অননুভূত থেকে যায়। মানসভূমির অন্তর্ভুক্ত এই অস্তিত্বৰোধক ‘ আমি ’ র পশ্চাতে ‘

জ্ঞাতা ’ ‘ দ্রষ্টা ’ বা ‘ অধিকারী আমি ’ বলে যে ‘ মানসোত্তর আমি ’ রয়েছে সে - ই সর্ব ব্যাপারে প্রকৃত কর্তা ও মনের অস্তিত্বও তৎ - সাপেক্ষ। মনের এই ‘ দ্রষ্টা আমি ' - কেই অণুচৈতন্য বা আত্মা বলা হয়। এভাবে সূক্ষ্ম বিচার - বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তেই আসি যে আত্মা তথা অণুচৈতন্য আর মন এরা দুটি পৃথক সত্তা।

কিন্তু আত্মা আর মন এরা দুটি পৃথক সত্তা হলেও একে অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মনের ক্রিয়ান্বিত আমি তথা তন্মাত্র - ৰাহকতায় বস্তুরূপ প্রাপ্ত ‘ চৈত্তিক আমি ’ ‘ অস্তিত্বৰোধক আমি'র উপস্থিতি - সাপেক্ষ। ' অস্তিত্বৰোধক আমি'র সাক্ষীভূত সত্তা আত্মা বা অণুচৈতন্য , যে ' আমি ' অস্তিত্বৰোধ জাগায় তথা আত্মিক সত্তার উপস্থিতি প্রমাণ করে তা মহত্তত্ত্ব , যে ' আমি ' ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ' অহংতত্ত্ব , আর যে ' আমি ' বা মনের যে অংশ বস্তুরূপ ধারণ করে তা ' চিত্ত নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ একই ' আমি ' স্তরবিশেষে ও গুণৰন্ধন ভেদে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখন কীভাবে এই একই ‘ আমি ’ বিবিধ কার্যৰাহী রূপ

পরিগ্রহ করে ‘ আমি বোঝানো দরকার। আছি ' উক্তির পশ্চাতে ' আমি জানি আমি আছি ’ রূপ সাক্ষীসত্তার উপস্থিতি প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয়। আমি আছি ’ - র ‘ আমি ’ কিন্তু আত্মা হ’তে ভিন্ন জিনিস , কেননা এই ' আমি ' আত্মার উপস্থিতি সিদ্ধ করছে। তাই মহত্তাত্বিক ৰোধ উদ্বুদ্ধ হবার পশ্চাতে চৈতন্যের উপস্থিতি অনস্বীকার্য অর্থাৎ আত্মায় এভাবে মহত্তত্ব থাকতে পারে না।

কিন্তু সাক্ষীসত্তা ও পরিস্ফুট ' আমিত্ব ৰোধ ' সেই এক ‘ আমি’ র - ই কার্যবাহী রূপভেদ মাত্র। বস্তুতঃ সাক্ষীচৈতন্য স্বরূপ ‘ আমি ই নিজেকে ‘ আমি আছি ’ - র ‘ আমি ’ - তে বা মহত্তাত্বিক ‘ আমি’ তে অভিব্যক্ত করে নিজের অস্তিত্ব সিদ্ধ করে অর্থাৎ অণুচৈতন্যই অবস্থাভেদে মহত্তত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। এভাবে দেখা যায় যে অণুচৈতন্য বিবিধ কার্যবাহী রূপ পরিগ্রহ করার গুণে গুণান্বিত। এই গুণ চৈতন্য নয় , কেননা তাহলে অণুচৈতন্যকে মহত্তত্ত্বে অভিব্যক্ত হতে হত না। সুতরাং আত্মায়

চৈতন্য আর তার গুণ এ দু'টি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। আবার গুণবন্ধনের কারণস্বরূপ অপর কোন সত্তার অস্তিত্বও অবশ্যই রয়েছে। গুণবন্ধনের দ্বারা আত্মার স্থলাভিব্যক্তির এই কারণীভূত সত্তাই প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাবে আত্মা মহত্তত্ত্বে অভিব্যক্ত হয়।

প্রকৃতি কী ? প্রাকৃত সত্তাসমূহের নিয়ামক সত্তাই প্রকৃতি। প্রকৃতি স্বভাব বা গুণ নয়। উদাহরণস্বরূপ দাহিকাশক্তিকে আগুনের স্বভাব , গুণ বা সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বলা হয় কিন্তু আগুনকে এই গুণে গুণান্বিত করার পশ্চাতে অবশ্যই অপর কোন সত্তা রয়েছে। ঠিক তেমনি আত্মাও অপর কোন সত্তার দ্বারা গুণান্বিত হচ্ছে। আত্মা বা অণুচৈতন্যের এই গুণনিয়ামক সত্তাই প্রকৃতি — অভিব্যক্ত গুণ প্রকৃতি নয়। ‘ প্রকৃতি ’ একটা সংস্কৃত শব্দ ঃ প্র — কৃ + ক্তি = প্রকৃতি , যার অর্থ হচ্ছে বিশেষভাবে প্রকারভেদ সৃষ্টি করা। প্রকৃতির দ্বারা গুণান্বিত হয়েই অণুচৈতন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতি স্বরূপ উপলব্ধির

জন্যেই গুণান্বিত করে। যে - কোন ক্রিয়া - নিষ্পত্তিই শক্তি - সাপেক্ষ। আত্মিক সত্তাকে গুণান্বিত করে বলে ’ প্রকৃতিও তাই এক ক্রিয়াশীলা শক্তিবিশেষ। এই প্রকৃতির প্রভাবেই আত্মা বিবিধ কার্যবাহী রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতি একটা শক্তিবিশেষ। এখন প্রশ্ন ওঠে সে কার শক্তি ? প্রকৃতি আত্মিক শক্তি আর আত্মিক প্রভাবেই সে প্রভাবান্বিতা তথা গুণান্বিতা হয়। আত্মিক সত্তাতেই প্রকৃতির অবস্থিতি। বস্তুতঃ আগুন ও তার দাহিকাশক্তির ন্যায় এতদুভয়ের সম্পর্ক অবিনাভাবী ও অপৃথকসিদ্ধ। বস্তু - বিশেষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য যে ক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাব - সাপেক্ষ সেই শক্তির অভাবে বস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অভাবেও তাই অণুচৈতন্যের সত্তা - বিপর্যয় দেখা দেয়।

গুণৰন্ধনের দ্বারা ‘ আমি আছি ' - ৰোধের অভিব্যক্তি ঘটলে পরেই সাক্ষীসত্তা অণুচৈতন্যে সত্তাবোধ জাগে। যে গুণৰন্ধনে প্রকৃতি অণুচৈতন্যে অস্তিত্বৰোধের বিকাশ ঘটায় তাকে সত্ত্বগুণ বলে , আর এর পরিণামস্বরূপ মনের যে অংশ সংরচিত হয় তাকে

বলে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রভাবেই অণুচৈতন্যই স্ব - দেহে বুদ্ধিতাত্ত্বিক বা মহত্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটায়।

যাবতীয় কার্যই অস্তিত্ব - সাপেক্ষ। ‘ আমি ’ র অস্তিত্ব অসিদ্ধ থাকলে ‘ আমি ’ কিছু করতে পারে না। এস্থলে ‘ আমি ’ র দ্বিবিধ ও পরস্পর সাপেক্ষ রূপ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সাক্ষীসত্তা চৈতন্য “ আমি আছি ” বোধের বিকাশ ঘটিয়ে তার অস্তিত্ব সিদ্ধ করছে , আর বিকশিত ‘ আমি ’ কার্য সম্পন্ন করছে। আমি আছি ’ র ‘ আমি ’ বা বুদ্ধিতত্ত্ব কার্যসম্পাদনকালে অস্তিত্ব সিদ্ধির অতিরিক্ত কার্যনিষ্পত্তির ভারও গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে বুদ্ধিতত্ত্বের ওপর প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে কার্যসম্পন্ন করার গুণ সৃষ্ট হয়। বুদ্ধিতত্ত্বও অণুচৈতন্যেরই স্থূলাভিব্যক্তি , আর অণুচৈতন্যের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি এই রূপান্তরিত বুদ্ধিতাত্ত্বিক বিকাশেও অবিচ্ছেদ্যরূপেই থাকে। যে গুণবন্ধন এই বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রভাবিত করে তাকে রজোগুণ বলে। এভাবে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্বিবিধ কার্যবাহী রূপ পরিগ্রহ করে।

রজোগুণ - সৃষ্ট কার্য নিষ্পত্তির গুণ বা ক্ষমতা বিশেষ অহংতত্ত্ব নামে পরিচিত। অর্থাৎ প্রকৃতির রজোগুণী ৰন্ধনে বুদ্ধিতত্ত্ব নিজেকে অহংতত্ত্বে বিকশিত করে।

কর্ম মাত্রেরই ফল অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্ততঃ পুস্তক দর্শনকালে দর্শন ক্রিয়ার পরিণতি হ'ল দৃষ্ট পুস্তক। দর্শনক্রিয়া কীভাবে নিষ্পন্ন হয় তা' পূর্বেই বোঝানো হয়েছে। মনেরই স্থূলতম অংশ চিত্ত তন্মাত্রৰাহকতায় বস্তুরূপ ধারণ করলে অহংতত্ত্ব তা' দেখে। আবার অহংতত্ত্বের ইচ্ছা - সাপেক্ষেও চিত্ত বস্তুভাব প্রাপ্ত হতে পারে। অহংতত্ত্ব যখন পুস্তক দেখে তখন চিত্ত পুস্তকই হয়ে যায়। কাজেই চিত্তধাতুর সংরচনা সম্পূর্ণভাবেই অহংতত্ত্বের ইচ্ছাধীন। চিত্ত ও অহংতত্ত্বের সম্পর্ক তাই খুব ঘনিষ্ঠ। এই চিত্তধাতু কেমন করে সৃষ্ট হয় তা ৰোঝানো দরকার। চিত্ত মনের একটি অংশবিশেষ, মনের অপর অংশ দু' টি হ'ল যথাক্রমে অহংতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব। প্রকৃতির রজোগুণী প্রভাবে মহত্তত্ত্ব অহংতত্ত্বে

অভিব্যক্ত হয় । আরও স্পষ্ট কথায় মৌলিক সত্তা অণুচৈতন্যেই প্রকৃতির প্রভাবে স্থূলত্ব প্রাপ্তির দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজেকে অহংতত্ত্বে রূপান্তরিত করে । তাই অহংতত্ত্বেও প্রকৃতি রয়েছে ও তাকে গুণান্বিত করছে । বস্তুতঃ অহংতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির প্রভাবের ফলেই চিত্তের সৃষ্টি হয় । যে গুণৰন্ধনে অহংতত্ত্ব গুণান্বিত হয় তাকে বলা হয় তমোগুণ । এই তমোগুণী প্রভাবেই অহংতত্ত্ব তার কর্মফলের ভাবগ্রাহী রূপ পরিগ্রহ করে ’ চিত্ত নামে অভিহিত হয় । এভাবে অণুচৈতন্যই ক্রমপর্যায়ে নিজেকে চিত্তে বিকশিত করে ।

অতএব প্রাকৃতিক গুণৰন্ধন - সৃষ্ট মনের অস্তিত্ব অণুচৈতন্যের উপস্থিতি - সাপেক্ষ । ৰস্তুতঃ আত্মা বা অণুচৈতন্যের অনুপস্থিতিতে মন সৃষ্ট হ’তে পারে না । কিন্তু প্রতিটি ব্যষ্টিসত্ত্বাতেই আমরা মনের বিকাশ দেখি , আর তাই প্রতিটি ব্যষ্টিসত্ত্বায় অণুচৈতন্যের উপস্থিতিও অনস্বীকার্য । এ বিশ্বের অসংখ্য ব্যষ্টিমানসের প্রতিটিতেই প্রতিফলন হয় বলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে আত্মা অনেক । এ সকল আত্মার

সামূহিক নামই পরমাত্মা , ভূমাচৈতন্য , ব্রহ্ম বা ভগবান । যেমন ১২ টিতে এক ডজন , ২০ টিতে এক কুড়ি ও বহুসংখ্যক সৈন্য মিলে সৈন্যদল হয় , ঠিক তেমনি অণুচৈতন্যের সামূহিক নামই হচ্ছে পরমাত্মা , ভূমাচৈতন্য বা ভগবান । তাই ‘ ভগবান ' অর্থে হস্ত - পদবিশিষ্ট শক্তিশালী মানুষের কল্পনা ভুল । ইংরেজীতে ‘ আত্মা ’ শব্দের প্রতিশব্দ নেই , তবে নিকটতর শব্দ হিসেবে Soul শব্দটি ব্যবহৃত হ’তে পারে । তাই ভগবান অর্থে ভূমাচৈতন্য বা Universal Soul- কেই ৰোঝায় । অতএব ভগবান আছেন , আর তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা , ভূমাচৈতন্য , ব্রহ্ম বা আনন্দস্বরূপ ।

সূচীপত্র

বিভু সত্তা কী ?

যুক্তিতর্কে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ব্রহ্ম আছেন , আর তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা ও ভূমাচৈতন্য বা চৈতন্যের সামবায়িক রূপবিশেষ ।

ভূমাচৈতন্য বা সামূহিক চৈতন্যকে চিতিশক্তি বা পুরুষও বলা হয় । প্রকৃতি পুরুষ বা চৈতন্যের শক্তিবিশেষ যা পুরুষের ওপর গুণৰন্ধন আরোপ করে । আগুন ও তার ধর্ম দাহিকাশক্তির ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য । যেখানে প্রকৃতি রয়েছে সেখানে পুরুষও অবশ্যই রয়েছে , আর এদের সামবায়িক নামই হচ্ছে ব্রহ্ম।

পুরুষ হচ্ছে জ্ঞান বা চৈতন্যসত্তা । জ্ঞান বা চৈতন্য বলতে আমরা কোন কিছুর অস্তিত্ব অবশ্যই বুঝি , কিন্তু তার আকার বা রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণা নিতে পারি না । ভাবনার (বিষয়ান্তর্গত মনের স্বরূপ অন্বেষণ ক্রিয়া) দ্বারাই আমরা পুরুষের ধারণা নিতে পারি । সুতরাং পুরুষ বা চৈতন্য একটা অব্যক্ত অবস্তু সত্তা

যা কেবল মনের বৈষয়িক ভূমিকায় অনুভূত হয়ে থাকে। এই অব্যক্ত পুরুষের গুণৰন্ধনের কারণীভূত সত্তা প্রকৃতিও কেবল ৰোধক্রিয়ার দ্বারাই অনুভূত হয়ে থাকে। শক্তি , গুণ বা বৈশিষ্ট্য– এগুলো জড়তম অভিব্যক্তি হলেও দর্শন - ভূমির আওতায় এরা আসে না। এদের রূপ - রেখা বর্ণনা করা যায় না। জড়বস্তু আগুনের জড় দাহিকাশক্তিকে দেখতে পাওয়া যায় না , অর্থাৎ বস্তুর সত্তাগত বৈশিষ্ট্য যত জড়ই হোক না কেন তা সর্বদা সূক্ষ্মই থেকে যায়। পুরুষ ও তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যে প্রকৃতি এই দুই সূক্ষ্মসত্তার সামবায়িক রূপ। ব্রহ্মও সূক্ষ্ম , আর তাই তিনি কেবল

বৌদ্ধিক সংশ্লেষণের চরম স্তরেই অনুভব্য। ব্রহ্মের তাই কোন আকার বা রূপ নেই — ব্রহ্ম এক নিরাকার অবাঙ্মনসোগোচর সত্তা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অণুচৈতন্য বা আত্মার ওপর প্রকৃতির সত্ত্বগুণী প্রভাবের ফলে বুদ্ধিতত্ত্ব , বুদ্ধিতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির

রজোগুণী প্রভাবের ফলে অহংতত্ত্ব আর অহংতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির তমোগুণী প্রভাবের ফলে চিত্তের সৃষ্টি হয় । তাই অহংতত্ত্ব বা প্রকৃতির তমোগুণী প্রভাবের অনুপস্থিতিতে চিত্তর সৃষ্ট হতে পারে না । কিন্তু অহংতত্ত্ব বা প্রকৃতি চিত্ত - সাপেক্ষ নয় । তাই চিত্তের অভাবেও এরা অবিকৃতই থেকে যায় । অনুরূপভাবে ৰুদ্ধিতত্ত্ব অহংতত্ত্ব নিরপেক্ষ আর অণুচৈতন্যও ৰুদ্ধিতত্ত্ব - নিরপেক্ষ সত্তা । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইস্পাত - নির্মিত কড়াইয়ের অস্তিত্ব ইস্পাত - সাপেক্ষ কিন্তু ইস্পাতের অস্তিত্ব কড়াই - সাপেক্ষ নয় । ঠিক তেমনি চিত্ত , অহংতত্ত্ব তথা ৰুদ্ধিতত্ত্ব– এরা অণুচৈতন্যের স্থলাভিব্যক্তি , আর তাই এদের অস্তিত্ব অণুচৈতন্য - সাপেক্ষ , কিন্তু অণুচৈতন্য হচ্ছে সর্বনিরপেক্ষ ।

চৈতন্য বা পুরুষ সর্বনিরপেক্ষ , আদি - অন্তহীন এক পরম ৰন্ধনমুক্ত সত্তা । প্রকৃতি হচ্ছে পুরুষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ । তাই পুরুষের সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিনাভাবী ও অপৃথকসিদ্ধ । কিন্তু তাহলেও আগুন যেমন তার গুণ বা বৈশিষ্ট্য দাহিকাশক্তির স্রষ্টা নয় ঠিক তেমনি পুরুষও তার গুণ বা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতির স্রষ্টা নয় , এমনকি পুরুষের নিজ অস্তিত্ববোধও প্রকৃতির প্রভাব - সাপেক্ষ । তাই তার পক্ষে প্রকৃতিকে সর্জন করার প্রশ্নই ওঠেনা । পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিও এক নিরপেক্ষ সত্তা । এই নিরপেক্ষ পুরুষ - প্রকৃতির সামবায়িক নামই ব্রহ্ম । তাই ব্রহ্ম অবশ্যই সর্বনিরপেক্ষ , সর্ববন্ধনমুক্ত এক শাশ্বত সত্তা ।

ব্রহ্মের আদি নেই , তবে অন্তও আছে কি ? যদি থাকে তাহলে পরিমাপ করে আমাদের দেখা দরকার যে ব্রহ্ম কত বড় । বস্তুভেদে পরিমাপের যন্ত্রও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । ভূমি পরিমাপের জন্যে শিকল , খাদ্যশস্যাদির জন্যে দাঁড়িপাল্লা , উত্তাপের জন্যে তাপমান যন্ত্র ও বায়ুচাপের জন্যে বায়ুচাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে । অর্থাৎ যে বস্তু যে ধরনের তার পরিমাপের জন্যে ঠিক সে ধরনের যন্ত্রই খুঁজে নিতে হয় । সূক্ষ্মসত্তা ব্রহ্মের পরিমাপের জন্যে তাই ব্রহ্মাতিরিক্ত সূক্ষ্ম কোন সত্তারই অন্বেষণ করতে হবে । জাগতিক বস্তুসমূহকে আমরা আকাশ , বায়ু , অগ্নি , জল ও ক্ষিতিভেদে পঞ্চ মৌলিক তত্ত্বে বিভক্ত করতে পারি । তন্মাত্রগত বিচারেই বস্তুর স্থূলত্ব ও

সূক্ষ্মতত্ব নিরূপিত হয়ে ’ থাকে । শব্দ , স্পর্শ , রূপ , রস ও গন্ধভেদে তন্মাত্রের সংখ্যা মোট ৫ টি । আকাশতত্ত্বে শব্দতন্মাত্রের বহন - সামর্থ্য রয়েছে , বায়ুতত্ত্বে রয়েছে শব্দ ও স্পর্শের , অগ্নিতত্ত্বে রয়েছে শব্দ , স্পর্শ , রূপের , জলতত্ত্বে শব্দ , স্পর্শ , রূপ ও রসের আর ক্ষিতিতত্ত্বে রয়েছে শব্দ , স্পর্শ , রূপ , রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রের বহন সামর্থ্য । অতএব তন্মাত্রের উপস্থিতি - নিৰন্ধন পঞ্চ মৌলিকতত্ত্বের কোনটাই সূক্ষ্ম নয় , আর তাই তজ্জাত স্থূল জাগতিক বস্তুসমূহের কোনটিই সূক্ষ্ম সত্তা ব্রহ্মের পরিমাপের পক্ষে উপযোগী নয় । জগতে আমরা এই স্থূল পঞ্চ মৌলিক সত্তার অতিরিক্ত ও তন্মাত্রভূমিবহির্ভূত এক সূক্ষ্ম মানস সত্তার অস্তিত্বও দেখতে পাই যা মানস - ভূমিতে ভাবনার দ্বারা বস্তুরূপ ধারণ করতে ও বস্তুর অনুভূতি লাভ করতে সমর্থ । কেবল এই মনই তাই ভাবনার দ্বারা বা অনুভূতির দ্বারা ব্রহ্মের পরিমাপ করতে পারে । অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির প্রভাব বিস্তারের ফলেই বুদ্ধিতত্ব , অহংতত্ব ও চিত্তের সমবায়ে এই মনের সংরচনা হয়ে থাকে । মনের এই অংশত্রয়ের মধ্যে অহংতত্ত্বই যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করে । তাই ব্রহ্মের পরিমাপ করতে গেলেও অহংতত্ত্বই তা ’

করবে। কিন্তু অহংতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বেরই কার্যবাহী রূপভেদমাত্র। অণুচৈতন্যের সংস্পর্শে আসার পূর্বেই অহংতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে তার অহংতাত্ত্বিক কার্যবাহী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে ও ওই অবস্থায় তার পক্ষে কোনপ্রকার কাজই করা সম্ভব নয় — অণুচৈতন্যের পরিমাপ করা তো দূরের কথা। অণুচৈতন্যসমূহের সামগ্রিক নামই ব্রহ্ম। মন কোন বিশেষ অণুচৈতন্যের পরিমাপ করতেই যখন অসমর্থ তখন তার পক্ষে সামূহিক চৈতন্য বা ব্রহ্মের পরিমাপ করার প্রশ্ন ওঠেনা।

পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের একটি অংশবিশেষ আর মনের অস্তিত্ব এ জগতের মধ্যেই। সংশ্লেষণাত্মক ধারাপ্রবাহে কার্যবাহী মনকে (অহংতত্ত্বকে) তার উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও আমরা দেখি যে আরও কিছু যেন অবশিষ্ট রয়ে গেল যার পরিমাপ করা মনের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব সৃষ্টির বিস্তৃতি মনের পরিধির বাইরে — সৃষ্টি অনন্ত। এখন আংশিক বিকাশ সৃষ্টি যখন অনন্ত তখন সামগ্রিক সত্তা ব্রহ্ম অবশ্যই অনন্ত।

ব্রহ্মস্বরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই নিরপেক্ষ ও সর্বন্ধনমুক্ত। প্রকৃতি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য , আর এর কাজই হচ্ছে পুরুষে গুণৰন্ধন আরোপ করা। সংস্কৃতে ‘ গুণ ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ৰন্ধন - রজ্জু। তাই প্রকৃতি পুরুষকে গুণান্বিত করার অর্থ রজ্জুর দ্বারা স্বেচ্ছামত বেঁধে ফেলা। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপবস্থায় যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই নিরপেক্ষ সেখানে পুরুষ স্বাধীন , আর তাই প্রকৃতি তাঁকে গুণান্বিত করতে পারে না। কিন্তু তাহলেও প্রকৃতি সেখানে অবস্থান ঠিকই করে। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের কর্মশক্তি যেমন ঘুমন্ত থাকে – নষ্ট হয়ে যায় না , , ঠিক তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থায় প্রকৃতির বন্ধনগত শৈথিল্য এলেও ৰন্ধনক্ষমতা পূর্ববৎ অটুট থেকে যায়। তাহলে স্বরূপাবস্থায় পুরুষ গুণাধীন নয়। প্রকৃতি , যার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যই হ’ল পুরুষের ওপর গুণৰন্ধন আরোপ করা , তার বন্ধন শিথিল হওয়ার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে। এর জন্যে কেবল দুটো কারণই থাকতে পারে। প্রকৃতি হয় নিদ্রিত , আর তাই

নিষ্ক্রিয় অথবা পুরুষের চেয়ে দুর্বল , আর তাই পুরুষে গুণৰন্ধন আরোপ করতে অসমর্থা। কিন্তু গুণৰন্ধন আরোপ করার কালে নিদ্রিতা প্রকৃতির জাগরণের জন্যে সেই নির্গুণাবস্থায় পুরুষাতিরিক্ত কোন সত্তার অবকাশ থাকে না বলে প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। প্রকৃতি নির্গুণব্রহ্মেও জাগ্রতা ও ক্রিয়াশীলা। কিন্তু সে পুরুষাপেক্ষা কম শক্তিশালিনী আর পুরুষে গুণৰন্ধন আরোপ করতে না পারার এটাই একমাত্র কারণ। অনাদি অনন্ত কাল থেকে পুরুষ - প্রকৃতি এভাবেই অবস্থান করছে। অতএব পুরুষ স্বভাবতই প্রকৃতি অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী , আর প্রকৃতি হল তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ। পুরুষের এই স্বরূপস্থিতিই নির্গুণব্রহ্ম পদবাচ্য।

প্রকৃত ৰন্ধনমুক্ত পুরুষকে বা ব্রহ্মস্বরূপ আর প্রাকৃত ৰন্ধনযুক্ত পুরুষকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। প্রশ্ন ওঠে , নির্গুণব্রহ্ম যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয় তাহলে সগুণ ব্রহ্মকে কী বলা যেতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ অধিকতর শক্তিশালী পুরুষকে প্রকৃতি কী করে গুণান্বিত করল বা সগুণ ব্রহ্মের উৎপত্তি কেমন করে হল ?

নির্গুণ ও সগুণ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অবস্থাভেদ মাত্র। কোন ব্যষ্টির নিদ্রিত থাকায় আর জাগরিত থাকায় যেমন তার পৃথগস্তিত্ব সূচিত হয় না ঠিক তেমনি প্রাকৃত গুণবন্ধনমুক্ত ও গুণবন্ধনযুক্ত পুরুষেও ব্রহ্মের পৃথগস্তিত্ব বোঝায় না !

অনন্তসংখ্যক অণুচৈতন্যেরই সামগ্রিক নাম ভূমাচৈতন্য , পরম পুরুষ বা সামূহিক চৈতন্য। উভয়েরই সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম এক , তবে অণুচৈতন্যের ক্ষেত্র সসীম আর পরমপুরুষের ক্ষেত্র অসীম। সামূহিক চৈতন্য বা পরমপুরুষের ওপর প্রকৃতির গুণবন্ধনের ফলেই জগতের তথা সগুণ ব্রহ্মের উদ্ভব।

সগুণ ব্রহ্ম - সাপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিসিদ্ধ পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সগুণ ব্রহ্মে প্রকৃতি পুরুষকে দুই

অবস্থায় গুণান্বিত করতে পারে — সগুণাস্থিতিতে প্রকৃতি নির্গুণাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী অথবা সগুণ পুরুষ নির্গুণের চেয়ে কম শক্তিশালী । প্রকৃতি এক ক্রিয়াশীলা শক্তিবিশেষ । বিদ্যুৎ প্রবাহের মত ক্রিয়াভূমির সর্বত্রই তার কার্যবাহী ক্ষমতায় পরিমাপ একই রকম । কাজেই সগুণ বা নির্গুণভেদে তার ক্ষমতার তারতম্যের কোন অবকাশ থাকে না । তাই পুরুষেরই * ঘনত্ব ও অঘনত্ব নিৰন্ধন প্রাকৃত প্রভাব দৃঢ় ও শিথিল হয় ।

★ *পুরুষ কেন অঘনাবস্থায় ছিল ও প্রকৃতি কবে থেকে তাঁকে গুণান্বিত করবার চেষ্টা করেছে এ ধরনের প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকে না, কেননা কার্য- কারণের আধার ব্যষ্টিমন বা সমষ্টিমনের উৎপত্তি সগুণ ব্রহ্ম- সাপেক্ষ । কাজেই ব্রহ্মের সৃষ্টির কারণ খুঁজতে যাওয়া মনের পরিধির বাইরে । বেদেও (নাসদীয় সূক্তে) একথা ঠিকই বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম নিজেও তাঁর সৃষ্টির কারণ জানেন না । ব্রহ্ম যদি কারণহীন না হতেন তাহলে নিশ্চয়ই*

তিনি কার্য- কারণ তত্বের আওতায় এসে পড়তেন ও অনাদি-অনন্তত্বের বিশেষণও হারিয়ে ফেলতেন।

অনাদি - অনন্ত নির্গুণ ব্রহ্মে প্রাকৃত ৰন্ধনের দৃঢ়তায় সগুণের বিকাশ হয়। আৰহাওয়াগত কারণে মহাসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অংশে সৃষ্ট ভাসমান বরফখণ্ডের মত সগুণ অবশ্যই নির্গুণের অন্তর্ভুক্ত। মহাসমুদ্রের বিস্তৃত অংশের অবশিষ্ট জলরাশি যেমন বরফের দ্বারা অপ্রভাবিত ও অবিকৃত থেকে যায় ঠিক তেমনি সগুণাতিরিক্ত নির্গুণ অবিকৃতই থেকে যায়। কাজেই সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতির প্রভাবাধীন পুরুষ সগুণ পদবাচ্য। কিন্তু স্বরূপ উপস্থিতিতে পুরুষ প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই সগুণ ব্রহ্ম বা গুণান্বিত পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ নয়, কিন্তু তাহ’ লেও পুরুষ - প্রকৃতির উপস্থিতিনিৰন্ধন এও ব্রহ্মপদবাচ্য। সগুণ ব্রহ্ম কী তা’ মহাসমুদ্রে ভাসমান বরফখণ্ডের উদাহরণ দিয়ে ৰোঝানো যেতে

পারে। আহাওয়াগত কারণে মহাসমুদ্রের জলরাশির কিয়দংশ বরফে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মহাসমুদ্রকে নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করলে বরফকে সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে আর বরফকে সগুণের পুরুষ তথা হেতুভূত কারণ আৰহাওয়াকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। মহাসমুদ্রের অবশিষ্ট অবিকৃত জলরাশি নির্গুণের পুরুষ - সদৃশ। মহাসমুদ্রবক্ষে বরফ ও অবিকৃত জলরাশি একই জলের অবস্থাভেদ মাত্র — এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে স্থানবিশেষে জলবায়ু জলকে বরফে রূপান্তরিত করতে সক্ষম তথা অন্যত্র অসক্ষম। বরফ জলেরই অবস্থাভেদ হলেও আমরা তাকে জল বলতে পারি না, ঠিক তেমনি সগুণ ব্রহ্মকেও আমরা ব্রহ্মস্বরূপ বলতে পারি না, কেননা সগুণ ব্রহ্মস্বরূপের অবস্থান্তর বিশেষ। কাজেই ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত আমাদের নির্গুণকে জানতে হবে, কেবল বিকল্পযুক্ত সগুণের উপলব্ধি আমাদের পরমসত্তার উপলব্ধির পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

তাহলে ভগবান কী বা কে ? তিনি কি সগুণ না নির্গুণ ? ‘ ভগবান ’ একটা সংস্কৃত শব্দ । ' ভগ ' শব্দের উত্তর ‘ মপ্ ' প্রত্যয় করে ’ ‘ ভগবান্ ' শব্দ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ ' ভগ ' যাঁর আছে তিনিই ভগবান । ' ভগ ' শব্দের অর্থ শাশ্বত শক্তি , প্রেম ও জ্যোতি , আর তাই ভগবান অর্থে আমরা জ্যোতির্ময় , মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান এক সত্তাকে বুঝি । এ সকল গুণবৈশিষ্ট্য - নিবন্ধন ভগবানকে অবশ্যই গুণান্বিত বা গুণযুক্ত পুরুষ বলতে হবে । নির্গুণাবস্থায় পুরুষ গুণান্বিত হন না — সগুণাবস্থায়ই তিনি গুণান্বিত । এভাবে ভগবান নির্গুণের অবস্থাভেদে বিকল্পযুক্ত সগুণের পর্যায়ভুক্ত বলে ব্রহ্মস্বরূপ বা পরম ব্রহ্মপদবাচ্য নন , আর তাই তাঁর উপলব্ধিতে পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না । ব্রহ্মস্বরূপকে জানবার জন্যে ভগবানের ঊর্ধ্বে উঠে নির্গুণকে উপলব্ধি করতে হবে — তিনিই সকলের আরাধ্য , তাঁকেই পেতে হবে ।

সূচীপত্র

জগৎ কী ?

অণুচৈতন্যের সামগ্রিকতা - নিৰন্ধন ব্রহ্ম সামূহিক চৈতন্য - পদবাচ্য। পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে যে প্রতিটি অণুচৈতন্য তথা ব্রহ্ম সর্বনিরপেক্ষ সত্তা। অণুচৈতন্যের সংখ্যা অনন্ত হ' লে পরেই তাদের সামগ্রিক রূপ ব্রহ্ম অনন্ত হতে পারেন। তাই অণুচৈতন্যের সংখ্যা অবশ্যই অনন্ত। এস্থলে প্রশ্ন ওঠে যে ব্রহ্ম কী করে অণুচৈতন্য সমূহের সমষ্টি হলেন ? ব্রহ্ম কি তা'হলে অনন্ত - সংখ্যক অণুচৈতন্যের অস্তিত্ব - সাপেক্ষ , না অণুচৈতন্য সমূহই ব্রহ্ম - সাপেক্ষ ? পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে , অণুচৈতন্য এক সর্বনিরপেক্ষ সত্তা , আর প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তাতেই রয়েছে এর অভিব্যক্তি। মানুষ কিন্তু কোন নিরপেক্ষ সত্তা নয় , এমনকি সে

ধরাপৃষ্ঠের প্রথম প্রাণীও নয় — ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয় । সৌরদেহ থেকে পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হ'ল তখন তা ' ছিল একটি গোলাকার অগ্নিপিণ্ড মাত্র । ধীরে ধীরে তাপ - বিকিরণে জলের তথা স্থলের সৃষ্টি হ'ল , এর পরে এলো গাছ - পালা আর জন্তু জানোয়ার , আর সর্বশেষে এলো মানুষ । কাজেই মানুষের মৌলিক অস্তিত্ব পৃথিবী - সাপেক্ষ , আর তাই সে নিরপেক্ষ সত্তা নয় । কিন্তু আত্মিক সত্তার সর্বনিরপেক্ষতা - নিৰন্ধন তার অস্তিত্ব অবশ্যই মানুষ সাপেক্ষ নয় — মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তার উপস্থিতি অনস্বীকার্য । সর্বনিরপেক্ষতার সামঞ্জস্য - নিৰন্ধন কেবল ভূমাচৈতন্যেই প্রাক্ পঞ্চভূত অণুচৈতন্যের অবস্থান সম্ভব । মানুষ সৃষ্ট হবার পরই তাতে অণুচৈতন্যের প্রতিফলন হয়েছে । অণুচৈতন্য ভূমাচৈতন্যের অংশবিশেষ , অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে অনন্ত - সংখ্যক অণুচৈতন্য এককভাবে ছিল না — ব্রহ্মই নিজেকে অনন্ত - সংখ্যক অণুচৈতন্যরূপে প্রতিফলিত করেছেন , আর এজন্যেই ব্রহ্মকে সমষ্টিচৈতন্য বলা হয়েছে । এ থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে ভূমাচৈতন্য থেকেই মানবীয় চৈতন্য বা আত্মা

সংগৃহীত হয়েছে। আদি - অনন্তবিশিষ্ট সান্ত - সীমিত পৃথিবী - সাপেক্ষ মানবাধারের অস্তিত্ব যে সূক্ষ্ম চৈতন্যভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা পৃথিবী থেকেই আহৃত হয়েছে , আর তাই বলতে হয় যে ক্ষিতিতত্ত্বেও রয়ে গেছে চৈতন্যাভিব্যক্তির প্রসুপ্ত সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ততঃ দুগ্ধে মাখনের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই দুগ্ধ থেকে মাখন উত্তোলন করা যায় , ঠিক তেমনি ক্ষিতিতত্ত্বে অণুচৈতন্যের উপস্থিতি না থাকলে পরে তৎসাপেক্ষ মানবাধারে অণুচৈতন্যের অভিব্যক্তি হ'তে পারত না। দুগ্ধস্থিত মাখনকে মন্থন - যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকে মাখন বলে নিরূপিত করা যায় না , ঠিক তেমনি ক্ষিতিতত্ত্বে অণুচৈতন্যের অপরিস্ফুট ও প্রসুপ্ত সম্ভাবনা অভিব্যক্ত হয়ে কেবল মানবীয় মনেই প্রতিফলিত ও অনুভবসিদ্ধ হয়। পৃথিবীর অস্তিত্ব সূর্য সাপেক্ষ , আর সূর্য হচ্ছে জ্বলন্ত - বাষ্পপিণ্ড বিশেষ , অর্থাৎ তেজস্মান সত্তা সূর্য বায়বীয়তত্ত্ব - সাপেক্ষ। অনুরূপভাবে বায়বীয় সত্তা ব্যোমতত্ত্ব সাপেক্ষ , কেননা ব্যোমতত্ত্বের অনুপস্থিতিতে স্থানাভাব হেতু বায়ুতত্ত্বের অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বই বায়ুতত্ত্বের , সূর্যের , পৃথিবীর তথা মানুষের মধ্যে উৎস। মানুষের মধ্যে আমরা

দেখতে পাই অণুচৈতন্যের বিকাশ , আর তাই তার উৎস ব্যোমতত্ত্বে অবশ্যই রয়েছে অণুচৈতন্যের অভিব্যক্তি । নিরাকার - নিরাধার হলেও একমাত্র শব্দ তন্মাত্রের বহন - সামর্থ্য নিৰন্ধন এই ব্যোমতত্ত্বও স্থূল প্রপঞ্চাত্মক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত । তবে স্থূল পর্যায়ভুক্ত হলেও ব্যোমতত্ত্ব এক সীমাহীন মহাশূন্যতা — এতে কোন স্থূল অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না । মানবীয় চৈতন্যের উৎস এই ব্যোমতত্ত্বে বরফে জলসদৃশ কেবল চৈতন্যই রয়েছে । ব্যোমতত্ত্বান্তর্গত এই চৈতন্যের উৎস হল ব্রহ্ম । ব্রহ্ম থেকেই ব্যোমতত্ত্ব তথা জগৎ উৎসারিত হয়েছে । বায়ু , অগ্নি , জল , পৃথিবী , পৃথিবীপৃষ্ঠের বনস্পতি তথা প্রাণীন বিকাশের উৎস হ'ল ব্যোমতত্ত্ব । তাই ব্যোমতত্ত্ব তথা ব্রহ্ম থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে । ব্রহ্মই হ'ল জগতের কারণীভূত সত্তা।

গুণান্বিত পুরুষ বা সগুণ ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করেছেন বা সগুণ ব্রহ্ম থেকেই জগৎ উৎসারিত হয়েছে । কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম যদি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে তিনি সৃষ্টির উপাদান

কোথা থেকে পেলেন ? কুম্ভকার তার ঘট তৈরী করার জন্যে পৃথিবী থেকে মৃত্তিকা আহরণ করে। সগুণ ব্রহ্মও কি তাহলে কোথাও থেকে সৃষ্টির উপাদান আহরণ করেছেন ? যদি তাই হয় তাহলে এই উপাদান ও তার সত্তাধিকারী সগুণ - ব্রহ্ম থেকে বড় ও সগুণ ব্রহ্মের পূর্ব থেকেই রয়েছেন একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে যে ব্রহ্ম এক নিরপেক্ষ সত্তা — ব্রহ্মাতীত বা ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছুর অস্তিত্বের অবকাশ নেই যা জগৎ - সৃষ্টির মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হ'তে পারে। আবার পরিদৃশ্যমান জগৎ কিছু না থেকে সৃষ্ট হয়েছে একথাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাই একথা অনস্বীকার্য যে সগুণ ব্রহ্ম নিজ দেহ দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করেছেন , অর্থাৎ জাগতিক বিকাশ সগুণ ব্রহ্মেরই স্থূল রূপায়ণ।

তাহলে ভগবানের সর্বগামিত্ব কি অযৌক্তিক কথা নয় ? ব্রহ্ম একটি পুস্তকে উপস্থিত রয়েছেন একথা বলতে গেলেই ব্রহ্ম ও পুস্তকের পৃথগস্তিত্ব সূচিত হয় অর্থাৎ পুস্তক যেন এক সগুণ ব্রহ্ম

বহির্ভূত সত্তা। এটা সর্বৈব ভুল, কেননা যাবতীয় জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মধাতুতে গড়া, ব্রহ্মই সব কিছুর রূপ পরিগ্রহ করেছেন অর্থাৎ পুস্তক আর ব্রহ্ম এরা দুটো পৃথক সত্তা নয়, আর পুস্তক ব্রহ্মাতীতও নয়। ব্রহ্মের অনাদি - অনন্তত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মাতীত কোন কিছুরই অবকাশ থাকে না। তাই পরিদৃশ্যমান জগতের সর্বসত্তার অস্তিত্ব ব্রহ্মেই বিধৃত — জগতের সূক্ষ্মতম থেকে জড়তম বিকাশ পর্যন্ত সব কিছুই ব্রহ্মময়।

প্রাকৃত গুণবন্ধনে সূক্ষ্মভাবগ্রাহী পুরুষসত্তার স্থূলায়নের ক্রমপর্যায়ে চন্দ্র - সূর্য, গ্রহ - নক্ষত্র, বায়ুমণ্ডল তথা পৃথিবীব্যাপ্ত জগতের সংরচনা হয়েছে। এখন দুগ্ধে মাখন সদৃশ পুরুষই যদি জগতের উৎস হয় তাহলে কেবল শব্দ - তন্মাত্রের বহন - সামর্থ্যযুক্ত ব্যোমতত্ত্বের মত সেও তার সূক্ষ্ম স্বরূপত্বের বিশেষণ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পূর্বেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে পুরুষ সূক্ষ্ম, অতএব সৃষ্টির বীজ পুরুষে নিহিত না থাকলে জগৎ তাঁর থেকে সৃষ্ট হয়েছে – এটাও একটা স্ব - বিরোধী উক্তি হয়ে পড়ে। তাই

যুক্তিতর্কে স্বীকার করে নিতে হয় যে স্থূল জগতের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই —— প্রাকৃত গুণবন্ধনে পুরুষের মানস স্তরে যে কল্পনা - তরঙ্গ উত্থিত হয় তা থেকেই এই বৈচিত্র্যময় কাল্পনিক জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। কাল্পনিক সত্তা বাস্তব জগতের জড়বস্তু সাপেক্ষ নয় , তাই সূক্ষ্ম পুরুষ স্ব - দেহ দ্বারা অনায়াসেই এই কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। সৃষ্টিকে একটা কল্পনা - তরঙ্গমাত্র বলে মনে করলে নিম্নোক্ত দ্বিবিধ সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়—

(১) জগতের বাস্তব অস্তিত্ব যদি না - ই থাকে তাহলে আমাদের নিকট কী করে তা সত্য বলে প্রতিভাত হয় ?

(২) পুরুষের কল্পনা - তরঙ্গ রুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিও নস্যাৎ হয়ে যাবার কথা। কল্পনা - তরঙ্গ তথা কাল্পনিক সত্তা ক্ষণস্থায়ী , আর তাদের বিনাশের অর্থই হ'ল জগতের প্রলয়। A 6

কল্পনা যখন মানুষের মনে কোন কাল্পনিক রূপের সৃষ্টি করে তখন তা কেবল কাল্পনিকই থাকে না , কল্পনাধীন মানুষের নিকট তার যাবতীয় কাল্পনিক সৃষ্টিই যথার্থ বলে প্রতীত হয়। কল্পনার

প্রভাব নষ্ট হয়ে গেলে পরেই সে ৰোঝে যে এটা একটা কল্পনামাত্র ছিল।

এখন কল্পনার বিশ্লেষণ করা যাক্ ও দেখা যাক্ কী করে কল্পানকালে কাল্পনিক বস্তুকে যথার্থ বলে মনে হয়। পূর্বের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে মনের যে অংশ যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন করে তা অহংতত্ত্ব , আর যে অংশ কার্যফলে রূপান্তরিত হয় তা চিত্ত। অর্থাৎ মানুষ যখন কোন কিছুর কল্পনা করে তখন অহংতত্ত্ব কার্যান্বিত হয় , আর চিত্ত ওই বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন ভাগলপুরে বসে কেউ কলকাতার চৌরঙ্গীর কল্পনা করলে তার অহংতত্ত্বও চৌরঙ্গীর চিন্তা করে ও চিত্ত চৌরঙ্গীর রূপ পরিগ্রহ করে। চিত্তের রূপ পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অহংতত্ত্বের কাল্পনিক দর্শনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

বিষয় - রূপ পরিগ্রহণের নিমিত্ত চিত্ত তন্মাত্রবাহিতায় প্রথমে বিষয়ের মূলধাতুতে (ভূতে) রূপান্তরিত হয়। দৃষ্টান্ততঃ পুস্তক দর্শনকালে চিত্ত রূপতন্মাত্র গ্রহণ করে। কিন্তু মানস - পটে পুস্তকের যথার্থ রূপ গৃহীত হবার পূর্বে চিত্তকে পুস্তকের মূলধাতু

ক্ষিতিতত্ত্বান্তর্গত কাগজে রূপান্তরিত হতে হয় । কাল্পনিক রূপ কিভাবে তৈরী হয় তা ’ জানলে পরেই ৰোঝা যাৰে যে কাল্পনিক সত্ত্বা যথার্থ হলে প্রতিভাত হয় কেন ।

ইন্দ্রিয়বাহকতায় চিত্তের যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন হয় । অহংতত্ত্বের নির্দেশনায় তথা ইন্দ্রিয়বাহকতায় চিত্ত তন্মাত্র সান্নিধ্য লাভ করে বস্তুরূপ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু ভাগলপুরে বসে কলকাতার চৌরঙ্গীর কল্পনা করাটা ইন্দ্রিয় - সাপেক্ষ নয় , কেননা আড়াই শত মাইল দূরবর্ত্তী কলকাতা ইন্দ্রিয় ভূমি - বহির্ভূত , আর তাই চিত্ত ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই চৌরঙ্গীর রূপ পরিগ্রহণ করে । চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা - নিবন্ধন মানুষের দেশ - কাল পাত্রগত সম্বন্ধ ও পার্থক্যৰোধ থাকে না । ভাগলপুরের কোন ব্যষ্টি একমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানে যে সে ভাগলপুরে আছে । কিন্তু চিত্ত যদি সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও তৎপরিবর্তে চৌরঙ্গীর রূপ পরিগ্রহণ করে , সেক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয় তার চতুস্পার্শ্বস্থ বস্তুসমূহ থেকে তন্মাত্র গ্রহণ করতে পারে না ।

ফলতঃ ওই ব্যষ্টি ওই মুহূর্তে ভাগলপুরে বসেও কল্পনায় চৌরঙ্গীই দেখে থাকে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ৰন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিত্ত ভাগলপুরের রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না , আর তাই অহংতত্ব ভাগলপুরের কোন অংশ দেখতে পায় না– সে কেবল চৌরঙ্গীই দেখতে থাকে ও চৌরঙ্গীতে আছে বলেই মনে করে। চিত্ত নিজে কোন কল্পনা করে না — কল্পনা করে অহংতত্ব , আর চিত্ত অহংতত্ত্বের কল্পনানুরূপ বস্তুভাব প্রাপ্ত হয়। অহংতত্ত্বের কল্পনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের অহংতত্ত্বের কল্পনানুরূপ বস্তুভাব প্রাপ্ত হয়। অহংতত্ত্বের কল্পনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের কাল্পনিক রূপও নস্যাৎ হয়ে যায় ও ইন্দ্রিয়সমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখনই ওই ব্যষ্টি ৰোঝে যে এতক্ষণ সে যে চৌরঙ্গী দেখছিল তা কাল্পনিক ছিল। এ সকল কারণেই কল্পনাধীন ব্যষ্টির নিকট কল্পিত বস্তু যথার্থ বলে মনে হয়।

অহংতত্ত্বের নির্দেশনায় চিত্ত তন্মাত্র নিরপেক্ষভাবেও বস্তুর কাল্পনিক রূপ গ্রহণ করতে পারে। এভাবে গৃহীত বস্তু বাস্তব না হলেও চিত্তের রূপ পরিগ্রহণ ক্রিয়াটা কিন্তু অবাস্তব নয়।

কল্পনা তথা তার বাস্তব রূপায়ণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এখন দেখতে হৰে এ জগৎ সগুণ ব্রহ্মের কল্পনাপ্রসূত কি না । পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাকৃত প্রভাবে সগুণ ব্রহ্ম স্বদেহ দ্বারা জগৎ সংরচনা করেছেন । অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় , কেননা মনের অনুপস্থিতিতে কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় । প্রকৃতির প্রভাবে প্রতিটি অণুচৈতন্যই হয় মনের স্ফূরণ । তাই সামূহিক চৈতন্য বা সগুণপুরুষেও প্রাকৃত প্রভাব অনন্তসংখ্যক ব্যষ্টিমনের সমন্বয়ে সামূহিক মন বা ভূমামনের স্ফূরণ হয় । প্রতিটি অণুচৈতন্য যেমন ভূমাচৈতন্যের অংশবিশেষ প্রতিটি অণুমানসও তেমনি ভূমা মানসের অংশবিশেষ । অণুমানসের সামগ্রিকতা - নিৰন্ধন ভূমামানসও ৰুদ্ধিতত্ত্ব , অহংতত্ত্ব তথা চিত্ত এই তিনের সমন্বয়াত্মক । তা'হলে জগৎ ভূমামানসের কার্যবাহী অহংতত্ত্ব - সাপেক্ষ চিত্তবিশেষ । অহংতত্ত্বের নির্দেশে ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্রগ্রাহিতায় তথা তন্মাত্র নিরপেক্ষতায় অহংতত্ত্বের কল্পনা তরঙ্গে — এই দ্বিবিধ উপায়ে চিত্তের সংরচনা হতে পারে । সগুণ ব্রহ্মাতীত বা সগুণ

ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছুর অবকাশ না থাকায় তার চিত্তের পক্ষে কোন বাহ্যিক বস্তুর রূপ পরিগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই সগুণ ব্রহ্মের অহংতত্ত্বের কার্যফল বা চিত্তবিশেষ। চিত্তের এভাবে রূপ পরিগ্রহণ ক্রিয়াকে কল্পনা বলে। তাই জগৎ সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা।

অণুমানসের সামগ্রিকতা - নিবন্ধন ভূমামানসের নিকটও তার কল্পনা যথার্থ বলে প্রতীত হয়। ভূমামানসের কাল্পনিক জগৎ তাই তৎসাপেক্ষ অণুমানসের নিকট ধ্রুব সত্যরূপে গৃহীত হয়।

প্রায়ই দেখা যায় যে জাদুকর খেলা দেখাবার কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে একগাছা দড়ি শূন্যে নিক্ষেপ করে , আর তা শূন্যেই ঝুলতে থাকে। তার সাহায্যকারী তখন একখানা তলোয়ার হস্তে ওই দড়ি ধরে ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় যে তার ছিন্ন মস্তক , অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ তথা ধড় রক্তাক্ত অবস্থায় একে একে নীচে পড়তে থাকে আর দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে। জাদুকর তখন বিলাপ

করতে করতে তার বন্ধুর ছিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ আহরণ করে একটি থলিতে পুরতে থাকে ও দর্শকবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এভাবে করুণার্দ্র দর্শকবর্গের থেকে যে চতুর্গুণ অর্থ আদায় করতে সমর্থ হয়। আর কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় যে তার সেই সাহায্যকারী দর্শকমণ্ডলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। দর্শকবর্গের সামনে জাদুকর কী করে এ ধরনের খেলা দেখায় ? এতগুলো লোক নিজের চোখে দেখে খেলাটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে না , আবার কারও মনই এটাকে সত্য বলে মেনে নিতে রাজী হয় না। তাহলে জাদুকর কি তার সেই ছিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ সাহায্যকারীকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছে ! এ ধরনের অস্বাভাবিক কাণ্ডকে সত্য বলে মনে হবার পশ্চাতে কী কারণ থাকতে পারে তা দেখা যাক্। প্রথমতঃ শূন্যে একটা দড়ি ঝুলে থাকতে পারে না , আর তা ধরে কোন মানুষও ওপরে উঠতে পারে না। আবার দেহকাণ্ড থেকে মস্তক ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর কোন মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব কথা। তাহলে কী করে লোক এমন ঘটনা দেখে ! সকলেই দৃশ্যটি দেখে নিজ নিজ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে

দর্শন ক্রিয়ার কর্তা হ'ল অহংতত্ত্ব , আর চিত্ত অহংতত্ত্বের নির্দেশে বস্তুরূপ প্রাপ্ত হয় । এখন জাদুকর যদি অনুশীলন - সঞ্জাত অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাবলে তার মানসভূমিকে প্রসারিত করে উপস্থিত দর্শকবর্গের অহংতত্ত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাহলে একযোগে দর্শকবর্গের অহংতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব রুদ্ধ হয়ে যাবে । জাদুকরের প্রসারিত মনই তখন দর্শকবর্গের সামূহিক মনের ভূমিকা গ্রহণ করে । তাই জাদুকর উপর্যুক্ত দৃশ্যের কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্ত তদ্ভাব প্রাপ্ত হ'   লে উপস্থিত দর্শকগণ জাদুকরের ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তাই দেখতে থাকে । জাদুকরের মানস - ক্ষমতা যদি ১০০ গজ পরিমিত স্থানকে ব্যাসার্ধ করে ব্যাপ্ত হবার মত হয় সেক্ষেত্রে তার ওই মানসভূমির অন্তর্গত ব্যষ্টিরাই ওই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হবে , বহিঃস্থ কোন স্থান থেকে কেউ তাকালে দৃশ্যটির কোন লেশও দেখতে পাৰে না — সে দেখৰে যে জাদুকর চক্ষু মুদে যুক্ত করে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে কী যেন কল্পনা করছে । জাদুকরের এই কল্পনাই তার প্রসারিত মানসভূমির অন্তর্গত দর্শকবর্গের নিকট বাস্তব সত্য বলে প্রতীত হয় — এটাই হল আসল কথা । অনুরূপভাবে

যোগভ্রষ্ট ব্যষ্টিরাও তাদের অতিপ্রাকৃত মানস - ক্ষমতার প্রভাবে ধুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা তথা মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈরী করে খেলা দেখিয়ে বেড়ায় । প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন মুদ্রা বা মিষ্টান্নাদি থাকে না ।

পরিদৃশ্যমান জগৎ সগুণ ব্রহ্মের মানস - কল্পনা হলেও আমাদের নিকট এক বিরাট সত্য । জাদুকরের ভোজবাজীতেও তারই সমর্থন পাওয়া যায় । জাদুকরের কাল্পনিক দৃশ্যকে আমরা যেমন বাস্তব বলে মনে করি ঠিক তেমনি সগুণ ব্রহ্মের মানস - কল্পনাকেও বাস্তব বলে গ্রহণ করি । জাদুকরের মানসভূমির বহিঃস্থ কোন স্থান থেকে তাকালে কেউ তার প্রদর্শিত খেলা দেখে না — সে তার পশ্চাতে যা সত্য তাই দেখে , ঠিক তেমনি সাধনা বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা যিনি ভূমামানসের আওতার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন তিনিও পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই দেখেন । ভূমামানসের কাল্পনিক জড় - জগৎ পরম সত্য না হলেও তদধীন মানুষ কখনো তা বুঝতে পারে না — ভূমামানসের ঊর্ধ্বে উঠলে পরেই কেবল তার উপলব্ধি হয় ।

অধ্যাত্ম অনুশীলন - সঞ্জাত এই উপলব্ধিই পরম সত্যের উপলব্ধি , আর যাঁরা এই পরম শাশ্বত সত্তাকে জেনেছেন তাঁদেরই বলা হয় সত্যদ্রষ্টা ঋষি ।

কেউ কেউ বলেন ব্রহ্মই কেবল সত্য ...... জগৎ মিথ্যা । দেখা যাক্ তাঁদের এই উক্তি কতটা ঠিক । জগৎ সগুণ ব্রহ্মের এক কাল্পনিক রূপ । এখন কাল্পনিক রূপ সত্য না হলেও তা একটা রূপ বটে আর ব্রাহ্মীচিত্তে জগতের রূপ পরিগ্রহণ ক্রিয়াটাও মিথ্যা নয় । তাহলে জগতের যখন একটা রূপ আছে তখন তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না , আবার এই রূপটা ব্রহ্মের কল্পনাবিশেষ হওয়ায় তাকে সত্য বলেও গ্রহণ করা চলে না । অতএব জগৎ সত্যও নয় , মিথ্যাও নয় — জগৎ আপেক্ষিক সত্য ।

জগৎ ব্রহ্মের কল্পনা - তরঙ্গবিশেষ , আর তাই কল্পনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিসমাপ্তি ঘটবে । এতে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে সৃষ্টি যদি নস্যাৎ হয় তবে তা কবে হবে আর এ পর্যন্ত তা কেনই বা হ'ল না । অঘন পুরুষসত্তার ওপর প্রাকৃত গুণৰন্ধনের ফলে কল্পনা তরঙ্গের তথা জগতের সৃষ্টি হয়েছে

অর্থাৎ প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ যে মুহূর্তে প্রকৃতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবেন সেই মুহূর্তেই তিনি কল্পনা - চক্র থেকে অব্যাহতি পাৰেন , আর সঙ্গে সঙ্গে জগতের অস্তিত্বও নস্যাৎ হয়ে যাৰে। গুণান্বিত সগুণপুরুষ নিজেকে অনন্তসংখ্যক অণুচৈতন্যে বিভক্ত করেছেন , তাই ব্রহ্ম হচ্ছেন এঁদেরই (অণুচৈতন্যসমূহেরই) সমষ্টি। প্রকৃতির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হ’ লে সগুণ ব্রহ্মকে প্রথমেই তাঁর অণুচৈতন্যসমূহকে প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত করতে হবে , আর তখনই কেবল সৃষ্টির লয় হওয়া সম্ভব। অনন্ত সংখ্যক অণুচৈতন্যের সামূহিক রূপ হওয়ায় কোটি কোটি অণুচৈতন্যের মুক্তিতেও সগুণ ব্রহ্মের মুক্তি হবে না– তখনও অবশিষ্ট থেকে যাৰে অনন্ত - সংখ্যক মুমুক্ষু অণুচৈতন্য। অনন্ত থেকে যে - কোন সংখ্যার বিযুক্তিতেও বিয়োগফল অনন্তই থেকে যায় , আর তাই লক্ষ কোটি অণুচৈতন্যের মুক্তিতে অবশিষ্ট অনন্ত - সংখ্যক গুণাধীন অণুচৈতন্যকে নিয়ে সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা - তরঙ্গ ঠিক চলতেই থাকৰে অর্থাৎ প্রতিটি অণুচৈতন্য মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুরুষের কল্পনা - তরঙ্গ চলতেই থাকৰে , অর্থাৎ প্রতিটি অণুচৈতন্য মুক্ত না

হওয়া পর্যন্ত পুরুষের কল্পনা - তরঙ্গ চলতেই থাকেব , আর সৃষ্টিরও লয় হবে না ।

জগৎ সগুণ ব্রহ্মের এক কাল্পনিক সৃষ্টি । এখন সগুণ ব্রহ্মের কল্পনায় এর সৃষ্টি কেমন করে হ'ল তা একটু ৰোঝানো দরকার । অহংতত্ত্বের সমর্থনে ও চৈত্তিক সাপেক্ষিকতায় কোন ব্যষ্টির ভাগলপুরে বসেই যেমন চৌরঙ্গীর মানস - অনুভূতি হতে পারে ঠিক তেমনি সগুণ ব্রহ্মের অহংতাত্ত্বিক নির্দেশনায় তাঁর চিত্ত পরিদৃশ্যমান জগতের রূপ পরিগ্রহণ করে , আর এই চিত্ত মনেরই অংশবিশেষ হওয়ায় জগৎ সগুণ ব্রহ্মের মানস - অভিব্যক্তিবিশেষ । চৌরঙ্গীর রূপ পরিগ্রহণের বেলায় যেমন সূক্ষ্মসত্তা চিত্ত স্থূল চৌরঙ্গীতে রূপান্তরিত হয় ঠিক তেমনি যে - কোন স্থূলসত্তার রূপ পরিগ্রহণের জন্যেই চিত্তকে সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে পরিবর্তিত হ'তে হয় । এই পরিবর্তন - ক্রিয়া আকস্মিক নয় । চিত্ত ধীরে ধীরে স্থূলত্বপ্রাপ্ত হয় , আর তাই সে স্থূলের রূপ যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারে । দুধ থেকে ক্ষীর প্রস্তুত করবার সময়ে দুধ যেমন ধীরে ধীরে ঘন হয়ে ক্ষীরে পরিণত হয় ঠিক তেমনি সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম চৈত্তিক সত্তাও প্রাকৃত বন্ধনের দৃঢ়তায় ধীরে ধীরে

জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে ক্ষিতিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয় । সুতরাং সৃষ্টি যা চিত্তের রূপান্তরণ ছাড়া আর কিছুই নয় তা ’ সূক্ষ্ম থেকে ধীরে ধীরেই স্থূলে নেৰে এসেছে ।

কিন্তু সৃষ্টি কী করে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হ’ল ? সগুণ ব্রহ্মে প্রকৃতি পুরুষকে গুণান্বিত করে , আর তারই ফলস্বরূপ জগৎ সৃষ্ট হয় । অণুচৈতন্যের ন্যায় প্রকৃতির সত্ত্বগুণী ৰন্ধনে ও বুদ্ধিতত্ত্বের স্ফূরণে পুরুষে আমিত্বৰোধ জাগে । আবার বুদ্ধিতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির রজোগুণী ৰন্ধনে অহংতত্ত্ব , আর অহংতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির তমোগুণী ৰন্ধনে চিত্তের সৃষ্টি হয় । ৰুদ্ধিতত্ত্ব , অহংতত্ত্ব ও চিত্ত এই তিন সূক্ষ্ম সত্তার সমন্বয়ে মন সৃষ্ট । সূক্ষ্ম ভাবময় জগৎ বা সগুণ ব্রহ্মের মন এভাবেই প্রকৃতির গুণৰন্ধনে সৃষ্ট হয় । বুদ্ধিতত্ত্ব , অহংতত্ত্ব ও চিত্ত পুরুষ বা চৈতন্যের ক্রমরূপান্তরণ বিশেষ । এদের মধ্যে বুদ্ধিতত্ত্ব সূক্ষ্মতম , অহংতত্ত্ব তদপেক্ষা কম সূক্ষ্ম আর অহংতত্ত্বের বিষয়ভাব চিত্তের স্থান হ’ল তারও পরে । বুদ্ধিতত্ত্বে কেবল অস্তিত্বৰোধ রয়েছে , অহংতত্ত্বে তদতিরিক্ত কর্তৃত্বাভিমানও রয়েছে । একাধিক গুণের উপস্থিতিতে অহংতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বের চেয়ে

স্থূল। চিত্ত অহংতত্ত্বেরই কার্যফলের রূপ পরিগ্রহণ করে, তাই অহংতত্ত্বের চেয়ে চিত্ত অবশ্যই স্থূল। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের দিকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জগৎ ভূমামানসের কল্পনা। সগুণ ব্রহ্মের অহংতাত্ত্বিক কল্পনা - তরঙ্গের ওপর রজোগুণী বন্ধনের ফলে তার বিষয়ভাব চিত্ত স্থূল জগতের রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম চিত্ত স্থূলে পর্যবসিত হয়। স্থূলায়নের পথে চিত্ত ধীরে ধীরে ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি — এই পঞ্চ মৌলিক তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহণ করে। এই পঞ্চ মৌলিক তত্ত্বসমূহ স্থূল, আর জগৎ এই স্থূল মৌলিক তত্ত্বসমূহ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। যাকে অবলম্বন করে ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মভাবে বস্তুরূপ গ্রহণ করে তাকেই আমরা তন্মাত্র ৰলি। শব্দ - স্পর্শ - রূপ - রস গন্ধ ভেদে তন্মাত্র পাঁচ রকমের। সূক্ষ্ম স্তরে একাধিক তত্ত্বের উপস্থিতি নিৰন্ধন অহংতত্ত্ব যেমন বুদ্ধিতত্ত্বের চেয়ে স্থূল ঠিক তেমনি স্থূল স্তরে যে বস্তুর যত বেশী সংখ্যক তন্মাত্র ৰহন - সামর্থ্য রয়েছে সেই বস্তু তত বেশী স্থুল বলে বিবেচিত হয়। আর তন্মাত্রের অনুপস্থিতি

মানেই চরম সূক্ষ্মত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মের উপলব্ধিতে তন্মাত্র আমাদের কোন সাহায্যই করতে পারে না , কেন না সেখানে তন্মাত্রের কোন অবকাশই থাকে না । একমাত্‌র ভাবনার দ্বারাই অর্থাৎ আমাদের বিষয় - সংলিপ্ত মনের স্বরূপানুধাবন ক্রিয়া দ্বারাই তার উপলব্ধি সম্ভব । চিত্ত জড়জগতের রূপ পরিগ্রহ করে , তাই চিত্তে অবশ্যই তন্মাত্র রয়েছে , আর একে তন্মাত্রে রূপান্তরিত হতেও হচ্ছে , কেন না অন্য কোন সূত্র থেকে এতে তন্মাত্র গৃহীত হবার কোন অবকাশ থাকে না । তাই চিত্ত থেকেই ক্রমপর্যায়ে পঞ্চ - তান্মাত্রিক ও পাঞ্চভৌতিক জগতের বিকাশ ঘটেছে । গ্রহ - নক্ষত্রাদি - বেষ্টিত সীমাহীন শূন্যতাই ব্যোমতত্ত্ব বা আকাশতত্ত্ব নামে পরিচিত । এই শূন্যতা একটা ‘ কিছু - না ’ জ্ঞাপক সংজ্ঞা হলেও কেবল শব্দ তন্মাত্রের বহন - সামর্থ্য নিবন্ধন একে আমরা স্থূল বলে থাকি । বৈজ্ঞানিকেরা একে ইথার বলেন । শূন্য বা ইথারের কোন রূপ বা আকৃতি নেই , এর কোন ওজন নেই , কিন্তু শব্দ তন্মাত্র এর ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে বলে এর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু রয়েছে যাকে ভিত্তি করে শব্দ - তন্মাত্রের উদ্ধৃতি সম্ভব , আর এজন্যেই ইথারকে আমরা স্থূল বলে থাকি । কিন্তু স্থূলের পর্যায়ে এ

হ'ল সূক্ষ্মতম , কেন না এতে রয়েছে কেবল একটিই তন্মাত্র । অতএব জাগতিক বিকাশের প্রথম ধাপেই শব্দ - তন্মাত্র ও আকাশতত্ত্বের সংরচনা হয়েছিল ।

চিত্ত আকাশতত্ত্বে রূপান্তরিত হবার পর নিজেকে শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রযুক্ত অধিকতর স্থূল বায়ুতত্ত্বে রূপান্তরিত করেছে । শব্দ তন্মাত্রকে বায়ু স্থানান্তরে বহন করে নিয়ে যায় , আবার বায়ুর উপস্থিতি আমরা স্পর্শের দ্বারাও বুঝতে পারি । অতএব বায়ুতে আমরা শব্দ ও স্পর্শ এই দু'টি তন্মাত্রকেই পেয়ে থাকি , আর তাই বায়ুতত্ত্ব আকাশতত্ত্বের (যাতে কেবল শব্দ - তন্মাত্রই রয়েছে) চেয়ে অবশ্যই স্থূল ।

স্থূলায়নের ক্রমপর্যায়ে বায়ুতত্ত্বের পর চিত্ত তেজস্তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে । আগুনে শব্দ ও স্পর্শের অতিরিক্ত রূপ - তন্মাত্রও আছে , কেননা আমরা দেখতেও পাই , আর তাই তান্মাত্রিক বিচারে তেজস্তত্ত্ব বায়ুতত্ত্বের চেয়েও স্থূল ।

তেজস্তত্ত্বের পর চিত্ত স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে জলতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে । জল তরল পদার্থ , এর একটা স্বাদ আছে । জলের ভেতর

দিয়ে আমরা শব্দ শুনতে পাই , জল স্পর্শ করতে পারি , দেখতে পাই , আবার এর থেকে রস - তন্মাত্রও পেয়ে থাকি। তাই এই চতুর্বিধ তন্মাত্রের উপস্থিতি - নিৰন্ধন জলতত্ত্ব তেজস্তত্ত্বের চেয়েও স্থূল।

আরও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে চিত্ত ক্ষিতিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়। ক্ষিতিতত্ত্বে বা পৃথিবীতত্ত্বে শব্দ - স্পর্শ - রূপ - রসের অতিরিক্ত গন্ধ তন্মাত্রও রয়েছে। ক্ষিতিতত্ত্বান্তর্গত টেলিফোনের তার দিয়ে শব্দ অতিক্রম করে ক্ষিতি আমরা স্পর্শ করতে পারি , দেখতে পাই , এতে একটা স্বাদ পাই , তাছাড়া এতে গন্ধও পাই। অতএব পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত এই ক্ষিতিতত্ত্ব বা ক্ষিতিভূতই হ'ল চিত্তের জড়তম অভিব্যক্তি।

সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছা - নিবন্ধন তাঁর অহংতাত্ত্বিক কল্পনাধারায় চিত্ত ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে জড়তম বিকাশ ক্ষিতিতত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে। চরম প্রাকৃত ৰন্ধনের ফলস্বরূপ সূক্ষ্ম চৈতন্যসত্তা অচেতন ক্ষিতিতত্ত্বে পর্যবসিত হয়ে অবশ্যই স্থূলায়নের পর্যায়ে নীত হয়েছে। পুরুষ বা ভূমাচৈতন্যের ওপর

এই চরম গুণৰন্ধন আরোপ করার পর প্রকৃতি ৰন্ধনীশক্তিরহিত হয়ে পড়ে বলে পুরুষকে ততোহধিক জড়ত্বের পানে নিয়ে যেতে পারে না। এভাবে ক্ষিতিতত্বে এসে পুরুষ প্রকৃতি উভয়েই অচেতন হয়ে পড়ে। পুরুষ আর অধিক স্থূল হতে পারে না, প্রকৃতিও তাকে অধিকতর স্থূলের পানে নিয়ে যাবার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে।
এস্থলে প্রশ্ন ওঠে যে জড়ত্বের চরম বিন্দুতে পুরুষ ও প্রকৃতির উপনীত হওয়াই কি তাহলে সৃষ্টির শেষ ? কিন্তু গাছ পালা, কীট - পতঙ্গ, পশু - পক্ষী প্রভৃতি চেতন জীবদের দেখে এ প্রশ্নও জাগে যে জাগতিক বিকাশের ক্রমপর্যায়ে এদের স্থান তো কোথাও দৃষ্ট হয়নি ! এদের উৎপত্তি তাহলে কেমন করে হ'ল ?

গুণৰন্ধনের দৃঢ়তা ও শিথিলতা ভেদেই পুরুষের জড়ত্ব তথা সূক্ষ্মত্বের মান নির্ধারিত হয়ে থাকে। এজন্যেই আমরা দেখি যে ক্ষিতিতত্বে গুণৰন্ধনের চরমাবস্থায় সূক্ষ্ম পুরুষ নিষ্প্রাণ জড়ে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ক্ষিতিতত্বের পরবর্ত্তী স্তরের গাছ - পালা ও জন্তু - জানোয়ার সমূহে পাঞ্চভৌতিক বিকাশ হলেও এদের আমরা অচেতন বা নিষ্প্রাণ জড়ের পর্যায়ে ফেলতে পারি না, কেননা এদের মধ্যে স্পষ্টতই রয়েছে প্রতিফলিত চৈতন্যাভিব্যক্তি। এদের

ক্ষিতিতত্ত্বের পরবর্ত্তী বিকাশ এজন্যেই বলছি যে ক্ষিতিতত্ত্বের পূর্বে এদের কোন ভূমিকা দৃষ্ট হয়নি। তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ভূমাচিত্তর স্থূলায়নের চরমাবস্থায় (ক্ষিতিতত্ত্বে) পৌঁছানোর পর আবার বিপরীত গতিতে গাছ - পালা বা জন্তু - জানোয়ারের স্তরে উন্নীত হয়ে ক্রমপর্যায়ে সূক্ষ্মের পানে এগিয়ে চলেছে।

ভূমাচিত্তের সূক্ষ্মত্ব অর্জন তার জড়ত্ব প্রাপ্তির ন্যায় ক্রমপর্যায়েই হয়ে থাকে। জমানো ঘি যেমন হঠাৎ গলে যায় না ঠিক তেমনি জড় ক্ষিতিতত্ত্বও হঠাৎ একেবারে সূক্ষ্ম হয়ে যেতে পারে না। গাছ - পালা ও পশু - জীবনের ক্রমোন্নয়ন - ধারা দেখেই বেশ বোঝা যায় যে ভূমাচিত্ত ক্রমপর্যায়ে সূক্ষ্মত্ব অর্জন করে চলেছে। পৃথিবীতে উদ্ভিদ , জীবনের প্রথমাবস্থায় জন্মেছিল ‘ কায়ী ’ নামক এক ধরনের শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ্। চৈতন্যের বিকাশ , তা যত অস্পষ্টই হোক্ না কেন , এর মধ্যে রয়েছে , আর তাই একে অচেতন পদার্থ বলতে পারি না। তারপর এলো পত্র - পুষ্প - সমন্বিত উদ্ভিদ যার মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ হয়ে উঠেছে আরও স্পষ্ট। তারপর ত্রমোন্নয়ন ধারায় এলো যথাক্রমে নিম্ন

কোটি তথা উষ্চ কোটির প্রাণীসমূহ। সৃষ্টির এই সূক্ষ্মাভিমুখী গতির শেষ পর্যায়ে হ'ল মানুষের আবির্ভাব। এভাবে আমরা প্রারম্ভিক স্তরের সৃষ্টি হিসেবে পাই কায়ীকে যার মধ্যে হয়েছে চৈতন্যের ব্যাপক অভিব্যক্তি। সৃষ্টি ক্রমপর্যায়ে কারী থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত হয়েছে। চৈতন্যের প্রতিফলন জড়সত্তা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সত্তাতেই অধিকতর স্পষ্ট, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব তথা জড়তত্ত্বের মাত্রার ওপরেই প্রতিফলনের ঘনত্ব ও অঘনত্ব নির্ভর করে। এই বিচারে প্রাণীন্ বিকাশে কায়ী হ'ল জড়তম আর মানুষ হ'ল সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি।

জড় থেকে সূক্ষ্মাভিমুখী গতিপ্রবাহে সৃষ্টি সূক্ষ্ম ও বন্ধনমুক্ত চৈতন্যের পানে এগিয়ে চলেছে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম ধাপে প্রাকৃত ৰন্ধনে পুরুষ জড়ে পর্যবসিত হয়, পরবর্তী ধাপে জড়সত্তা সূক্ষ্ম ও সর্বানুস্যূত পুরুষের পানে এগিয়ে চলে। এভাবে স্থূলায়ন ও সূক্ষ্মায়ন ভেদে সৃষ্টি - চক্রে দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়।

সৃষ্টি সগুণ ব্রহ্মের এক মানস - সংরচনা। প্রাকৃত গুণৰন্ধনে সগুণ পুরুষ স্থূলায়নের চরম পর্যায়ে ক্ষিতিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়,

আবার বিপরীত গতিতে সূক্ষ্মায়নের শেষ পর্যায়ে চৈতন্যোদ্দীপ্ত মানবীয় সত্তায় উন্নীত হয় । চৈতন্যের ক্রমহ্রাসমান গতিপ্রবাহে সৃষ্টি নেৰে আসে ক্ষিতিতত্ত্বে , আর চৈতন্যাভিব্যক্তির ক্রমবর্ধমান গতিপ্রবাহে সৃষ্টি এগিয়ে যায় মানুষের স্তরে । এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মানুষ হচ্ছে সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা তরঙ্গের চরম ও পরম অভিপ্রকাশ আর এর পরবর্ত্তী স্তর হ'ল সূক্ষ্ম ও ভাবময় ভূমাপুরুষে লীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রমোন্নয়নে মানুষ হচ্ছে প্রাণীন্ বিকাশের সর্বোচ্চ ধাপ ।

তাহলে ব্যোমতত্ত্ব ও মানুষ হচ্ছে যথাক্রমে সগুণ ব্রহ্মের মানস অভিব্যক্তির প্রথম ও শেষ স্তর । জগতে কোটি কোটি মানুষ ছাড়াও জীব - জন্তু , গাছ - পালা ও আরও অজস্র রকমের পাঞ্চভৌতিক বিকাশ দৃষ্ট হয়ে থাকে । আজকের চৈতন্যোদ্দীপ্ত মানবীয় সত্তার সম্ভাবনা প্রারম্ভিক স্তরে অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বেও নিহিত ছিল । বায়ু , অগ্নি , জল ও ক্ষিতিতত্ত্বে এসে সেই প্রসুপ্ত সম্ভবনারই স্ফূরণ ধাপে ধাপে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে । সৃষ্টির ক্রমবিকাশে ব্যোমতত্ত্ব মরুত্তত্ত্বে রূপান্তরিত হবার পর

ভূমামানসের কল্পনায় আবার নোতুন করে ব্যোমতত্ত্ব সৃষ্টি হয়ে শূন্যস্থান দখল করে নেয় । প্রতিটি তত্ত্বই একই পদ্ধতিতে ক্রমপর্যায়ে পরবর্ত্তী স্থূলতর তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে যায় , আবার পূর্ববর্ত্তী সূক্ষ্মতর তত্ত্বে নিহিত সম্ভাবনা থেকে তার সংরচনা হয় । তাই ব্রাহ্মী কল্পনার প্রথম ধাপের ব্যোমতত্ত্বে যে চৈতন্যসত্তা প্রসুপ্ত ছিল তা - ই সৃষ্টির স্থূলায়ন ও সূক্ষ্মায়নের ধারাপ্রবাহে অগ্রসর হয়ে আজ মানবীয় চৈতন্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে । চৈতন্যের অনভিব্যক্তি নিৰন্ধন আজ যে নিষ্প্রাণ বালুকণা আমাদের নিকট একটা উপেক্ষার বস্তু , সৃষ্টির ক্রমোন্নয়ন ধারায় তাকেও একদিন চৈতন্যোদ্দীপ্ত মানুষের ভূমিকায় পাওয়া যাৰে ।

সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্মত্ব ও সৃষ্টিচক্রের স্থূলায়ন ও সূক্ষ্মায়নের গতিপ্রবাহ দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সৃষ্টির উৎপত্তি সগুণ ব্রহ্ম থেকে হয়েছে , আর এর লয়ও হচ্ছে সগুণ ব্রহ্মতেই ।

পুরুষ স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম , ক্ষিতিতত্ত্বে প্রাকৃত ৰন্ধনের চরমাবস্থায় পুরুষের চরম জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে থাকে , আবার সৃষ্টির পরবর্ত্তী ধাপে অর্থাৎ জড়ত্বের ক্রমহ্রস্বমান নির্গুণাভিমুখী গতিপ্রবাহে পুরুষ ক্রমশঃ প্রাকৃত ৰন্ধন থেকে মুক্ত হতে থাকে

অর্থাৎ সূক্ষ্মাভিমুখী গতিতে পুরুষ যেমন প্রাকৃত ৰন্ধনমুক্ত হতে থাকে ঠিক তেমনি স্থূলাভিমুখী গতিতে পুরুষের ওপর প্রাকৃত ৰন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে , আর ক্ষিতিতত্ত্বে এসে তা এমন স্তরে পৌঁছায় যে পুরুষ তার গুণবৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে পর্যবসিত হয় । অপরদিকে স্থূলায়নের চরমাবস্থায় এসে ৰন্ধনীশক্তির চরম প্রয়োগ করে প্রকৃতিও ৰন্ধনীশক্তিরহিত হয়ে পড়ে , কিন্তু সৃষ্টিচক্রের দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ সূক্ষ্মায়নের পথে পুরুষের প্রতিফলন ক্রমশঃ প্রাকৃত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে থাকে । পুরুষের এই ক্রমমুক্তি নিৰন্ধন প্রকৃতি এখন আর তার ওপর নিজ গুণৰন্ধন ব্যাপকভাবে আরোপ করতে পারে না । এস্থলে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় যে প্রকৃতির সত্তাগত বৈশিষ্ট্য যখন পুরুষের ওপর ৰন্ধন আরোপ করা তখন পুরুষের পক্ষে ৰন্ধনমুক্ত হওয়া কী করে সম্ভব হতে পারে ?

প্রাকৃত ৰন্ধনের প্রভাবে ভূমাচৈতন্য বা সমষ্টিচৈতন্য নিজেকে যে ' অনন্ত - সংখ্যক অণুচৈতন্যে বিভক্ত করেন তারই কিছুটা অংশ ক্ষিতিতত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে ও সৃষ্টির সূক্ষ্মাভিমুখী গতিতে এরা ক্রমপর্যায়ে প্রাকৃত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে থাকে ।

সৃষ্টিচক্রের মূলীভূত সত্তা সগুণ ব্রহ্ম , আর তাই অণুচৈতন্যের জড়ত্বপ্রাপ্তি তথা গুণবন্ধনমুক্তি সম্পূর্ণরূপে তৎ - সাপেক্ষ। এখন সগুণ ব্রহ্ম নিজে যদি মুক্ত - পুরুষ না হন তাহলে অণুর মুক্তি তা থেকে কী করে সম্ভব ? শৃঙ্খলিত কোন ব্যষ্টি অপর কোন ব্যষ্টির শৃঙ্খল উন্মোচন করতে পারে না , শৃঙ্খলমুক্ত ব্যষ্টি কিন্তু অনায়াসেই তা করতে পারেন। তাই অণুর মুক্তিদাতা সগুণ ব্রহ্ম অবশ্যই মুক্ত পুরুষ।

মুক্ত পুরুষ কী বা কাকে বলে ? নির্গুণব্রহ্মে পুরুষ তথা প্রকৃতি উভয়েই স্বাধীন। স্বাধীন পুরুষকে প্রকৃতি গুণান্বিত করতে পারে না অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষ প্রাকৃত প্রভাবমুক্ত। তাই আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা যিনি নির্গুণপদ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই মুক্ত পুরুষ। আবার অপরের মুক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি যখন স্বেচ্ছায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রাকৃত বন্ধনের অধীন হন তখনও তিনি মুক্ত পুরুষ পদবাচ্য কেননা ওই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলেই প্রকৃতি আর তার ওপর কোন বন্ধন আরোপ করতে পারবে না। কাজেই সাধনাবলে যিনি নির্গুণত্ব অর্জন

করেছেন ও যিনি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় দেহধারণ করে প্রাকৃত ৰন্ধনের অধীন হন তিনিই মুক্ত পুরুষ।

গুণাধীন নন বলে মুক্ত পুরুষ অপরের ৰন্ধনের কারণ হতে পারেন না , কেননা অপরের বন্ধনের কারণ হতে গেলেই তাঁকে প্রাকৃত প্রভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়। সগুণ ব্রহ্মও মুক্ত পুরুষ বলে অপরের বন্ধনের কারণ তিনি হতে পারেন না। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম নিজে মুক্ত পুরুষ হলেও তাঁর থেকে উৎসারিত অণুসমূহ এককভাবে মুক্তা নয় — সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই তাদের ওপর প্রাকৃত ৰন্ধন আরোপিত হয়ে থাকে , আর তাই সগুণ ব্রহ্ম পরোক্ষভাবে অণুর বন্ধনের কারণ হন তথা নিজেও ৰদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই অণুসমূহ প্রাকৃত বন্ধনের আওতায় এলো কেন , আর জগতেরই বা সৃষ্টি হ'ল কেন ? পূর্বেই আমরা দেখেছি যিনি নির্গুণত্ব অর্জন করে স্বেচ্ছায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির প্রভাবাধীন হন তিনিই মুক্ত পুরুষ পদবাচ্য। সগুণ ব্রহ্মও মুক্ত পুরুষ বলে নির্গুণত্ব অর্জনের পর তিনিও স্বেচ্ছায় জন কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাকৃত গুণের অধীন হয়ে পড়েছেন। অণুচৈতন্যের প্রকৃত কল্যাণ হ'ল তাদের স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া

যেখানে তাদের ওপর প্রকৃতি আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না । অতএব প্রকৃতির বন্ধন থেকে অব্যাহতি পাওয়াতেই পুরুষের যথার্থ কল্যাণের বীজ নিহিত রয়েছে , কেননা এতে করেই পুরুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয় । তাই সগুণ ব্রহ্ম তাঁর প্রতিটি অণুচৈতন্যকে মুক্ত পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রাকৃত গুণের অধীন হয়েছেন ; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অণুচৈতন্যসমূহও প্রকৃতির অধীন হয়ে পড়েছে । প্রতিটি অণুচৈতন্যকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই যখন সগুণ ব্রহ্ম প্রকৃতির অধীন হয়েছেন তখন প্রতিটি অণুচৈতন্য মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বা তাঁর মত প্রত্যেকেই মুক্ত পুরুষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই প্রচেষ্টার আর বিরাম নেই ।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে প্রাকৃত - ৰন্ধন নিরপেক্ষ মুক্ত পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম যখন তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব - নিৰন্ধন ইচ্ছামাত্রেই অণুসমূহকে মুক্ত পুরুষ করতে পারতেন তখন তিনি তা না করে রেখে দিলেন কেন , এতে করে সৃষ্টির বিকাশই বা কেন ঘটালেন ?

প্রতিটি অণুর মুক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে সগুণ ব্রহ্ম নিজেকে অনন্ত সংখ্যক অণুতে বিভক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন ,

আর তা করবার জন্যেই তিনি জড়ত্বে নেবে এসেছেন , কেননা সূক্ষ্ম স্তরে বিভাজন ক্রিয়া সম্ভব নয় । দৃষ্টান্ততঃ আগুন যা ক্ষিতিতত্ত্বের চেয়ে সূক্ষ্ম ও তেজস্তত্ত্বের অন্তর্গত তাকে কি আমরা ভাগ করতে পারি ? পৃথকভাবে দু' টি দীপশলাকার সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে কাছাকাছি রাখলে অগ্নিশিখা দু' টি মিলেমিশে এক হয়ে যায় । আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন কিছুতেই তাদের পৃথগস্তিত্ব নিরূপণ করতে পারি না । কিন্তু দু' মুঠো ধুলো মিশে গেলেও সহজেই তাদের দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি ।
অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জল , আগুন , বায়ু , ব্যোম বা ততোঽধিক সূক্ষ্ম ভূমাচৈতন্যের পৃথকীকরণ কিছুতেই সম্ভব নয় । কেবল ক্ষিতিতত্ত্বেই ইচ্ছানুরূপ প্রকৃষ্ট বিভাজন ক্রিয়া সম্ভবপর হয় । তাই খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই একথা বলা যেতে পারে যে নিজেকে অনন্ত - সংখ্যক অণুচৈতন্যে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যেই সগুণ ব্রহ্ম সূক্ষ্ম থেকে চরম জড়ত্বে নেবে এসে ক্ষিতিতত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছেন ।

ক্ষিতিতত্ত্বেই অণুচৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় । তাই প্রাকৃত গুণৰন্ধনের চরম পর্যায়ে বা সঞ্চর ধারায় সগুণ ব্রহ্ম ক্ষিতিতহে পর্যবসিত হন ও পুনরায় সূক্ষ্মাভিমুখী গতিতে বা প্রতিসঞ্চরাত্মক ধারায় ৰন্ধনমুক্তির পানে এগিয়ে যান । প্রকৃতির বন্ধন থেকে চৈতন্যের মুক্ত হবার অর্থ হ'ল সূক্ষ্মতার ক্রমবিকাশ ঘটানো ও পরিণামে নির্গুণব্রহ্মে ফিরে যাওয়া । সৃষ্টির প্রথম ধাপে অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকে স্থূলাভিমুখী গতিতে ভূমাচৈতন্য নিজেকে অনন্ত - সংখ্যক অণুচৈতন্যে বিভক্ত করেন ও পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ স্থূল থেকে সূক্ষ্মাভিমুখী গতিতে অণুচৈতন্যসমূহকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করেন । সগুণ ব্রহ্ম প্রতিটি অণুরই মুক্তি চান ও তাঁর এই ইচ্ছাপূর্ত্তির অভিপ্রায়েই তাঁকে সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর ধারা - সমন্বিত সৃষ্টিচক্রের সংরচনা করতে হয় । তাই প্রতিটি অণুচৈতন্যকে মুক্তপুরুষ করে তোলবার উদ্দেশ্যেই সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েছেন বা জগৎ সংরচনা করেছেন ।

মুক্ত পুরুষ হতে গেলে নির্গুণত্ব অবশ্যই অর্জন করতে হবে , আর তাতেই হৰে সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছার পরিপূর্ত্তি । এখন

অণুচৈতন্যসমূহের নির্গুণত্ব অর্জনের ব্যাপারে সগুণ ব্রহ্মের ভূমিকা কী বা কতটুকু তা বিচার করে দেখা দরকার।

সগুণ ব্রহ্মের কল্পনাধীন সৃষ্টজগতে অনন্ত সংখ্যক অণুচৈতন্যের অভিব্যক্তি তাঁরই মানস - সংবেদনে বিধৃত। ব্যষ্টি বিশেষের কাল্পনিক সৃষ্টি যেমন তারই মানসভূমিতে সীমাদ্ধ — অপর কোন ব্যষ্টির মন যেমন তা দেখতে পারে না , ঠিক তেমনি সগুণ ব্রহ্মের কল্পনাসৃষ্ট অণুচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তাঁর মানস - ভূমিতেই সীমাদ্ধ। অণুচৈতন্য সমূহের পক্ষে ভূমামানসের আওতার বাইরে গিয়ে নির্গুণত্ব অর্জন করা সম্ভব নয় , আর তাই অণুর একক মুক্তি প্রচেষ্টাও সিদ্ধ হবার নয় অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিটি অণুকে মুক্ত করার ইচ্ছাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাহলে সগুণ - মানসের ইচ্ছা কী করে জয়যুক্ত হতে পারে তা দেখা দরকার। ব্রহ্ম তথা প্রকৃতি অনাদি অনন্ত সত্তা। পুরুষের অঘনত্ব - নিবন্ধন প্রাকৃত প্রভাবের প্রাবল্যে গুণান্বিত হয়ে ব্রহ্ম.সগুণ আখ্যা লাভ করেন। অনাদি অনন্ত ব্রহ্মে অঘন পুরুষও অনাদিকাল থেকে রয়েছে , প্রকৃতিও সেই অঘন পুরুষকে অনাদিকাল থেকে গুণান্বিত করে আসছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে

অনাদি অনন্তকাল থেকেই সগুণ ব্রহ্ম এক গুণান্বিত সত্তা , কিন্তু ইতোপূর্বেই সগুণ ব্রহ্মকে আমরা মুক্তপুরুষ বলে স্বীকার করে নিয়েছি । তাই বলতে হয় যে সগুণ ব্রহ্ম প্রথমে ৰদ্ধপুরুষ ছিলেন ও পরে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন । এস্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রকৃতি ও পুরুষাতিরিক্ত তৃতীয় কোন সত্তা ব্যতিরেকে ৰদ্ধ পুরুষকে কে মুক্ত করল ? কিন্তু যেহেতু তৃতীয় কোন সত্তার অবকাশ নেই , সুতরাং পুরুষের নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টাই তাঁর মুক্তির একমাত্র উপায় বা অবলম্বন । এভাবে প্রাকৃত প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তাকেই ৰলৰ সাধনা ।

মুক্তিলাভের পূর্বে সগুণ ব্রহ্মকে বলা হ’ত প্রজাপতি , আর সাধনার দ্বারা যখন তিনি মুক্তি অর্জন করলেন তখন তাঁর নাম হ’ল হিরণ্যগর্ভ ।

সগুণ ব্রহ্ম চান যে তাঁর প্রতিটি অণু প্রজাপতির ন্যায় সাধনা করে মুক্তপুরুষ হোক কিন্তু তিনি নিজে অণুসমূহের জন্যে নির্গুণত্ব অর্জন করতে পারেন না , আর তাই তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না । মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অণুচৈতন্যসমূহের প্রাথমিক প্রয়োজন হ’ল

নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সদা - সচেতন থাকা তথা মুক্তির জন্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। যে নিজের বদ্ধাবস্থা তথা পরনির্ভরশীলতার কথাই জানে না তার মুক্তির প্রশ্নও ওঠে না। বন্ধন ও পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি উপলব্ধি করেই মানুষ মুক্তির উদ্দেশ্যে তৎপর হয়। অণুচৈতন্যের ব্যাপক বিকাশ না ঘটলে পরে তার বন্ধন - জ্ঞান গভীর হয় না, মুক্তি প্রচেষ্টাও প্রবল হয় না। তাই মুমুক্ষু অণুচৈতন্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটা প্রয়োজন। ক্ষিতিতত্ত্বে চরম প্রাকৃত জড়ত্ব - নিৰন্ধন নিষ্প্রাণ অণুসমূহের মধ্যে অস্তিত্বজ্ঞানই জাগে না, অতএব ক্ষিতিভূমির অণুচৈতন্যের পক্ষে তার নিজ মুক্তি অর্জন করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। তাই সগুণ ব্রহ্মই তাদের যতটা সম্ভব প্রাকৃত ৰন্ধন থেকে মুক্ত করেন। সগুণ ব্রহ্মের এই প্রচেষ্টায় ক্রমপর্যায়ে মানুষের আবির্ভাব হয় যার মধ্যে আমরা প্রতিফলিত চৈতন্যের ব্যাপক বিকাশ দেখতে পাই। এই মানুষ তার ৰন্ধন সম্বন্ধে খুব সচেতন, মুক্তিলাভের জন্যেও সে খুব তৎপর। মানুষের মধ্যেও চৈতন্যের অভিব্যক্তি পূর্ণত না হলেও অভিব্যক্ত চৈতন্যের প্রসাদে সে

সাধনার প্রেরণা লাভ করে। তথা সাধনার দ্বারা মুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করে। সুতরাং সাধনাবলে মুক্তি - অর্জনের উপযুক্ত মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই সগুণ ব্রহ্ম জগৎ সংরচনা করেছেন অর্থাৎ সাধনা করে মুক্তিলাভ করার জন্যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। যে এই সাধনা করে না , সে ভূমা - ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে– তার মনুষ্য - জন্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অণুচৈতন্য তথা মানবীয় চৈতন্য এক পাঞ্চভৌতিক আধার সাপেক্ষ মানসপটে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ভূমাচৈতন্যের ক্ষেত্রে স্থূল আধারের প্রয়োজন নেই , মানুষের ন্যায় সগুণ ব্রহ্মের কোন আধার থাকে না। মানুষ হ'ল সগুণ ব্রহ্মের এক মানস - কল্পনা - বিশেষ আর এর অস্তিত্ব তাঁর মানসভূমির অন্তর্গত। সগুণ ব্রহ্ম যদি অপর কোন সত্তার মানস কল্পনাবিশেষ হতেন বা মানসভূমি - সাপেক্ষ হতেন তাহলে তাঁরও স্থূল আধারের প্রয়োজন হ' ত , কিন্তু যেহেতু তিনি দেশ - কাল পাত্র নিরপেক্ষ এক আদি - অন্তহীন সত্তা সেজন্যে তাঁর ক্ষেত্রে কোন সাপেক্ষিকতার তথা আধারের প্রশ্ন ওঠে না। অণুমানসের সাক্ষীসত্তা অণুচৈতন্য ভূমামানসের

সাক্ষীসত্তা ভূমাচৈতন্যের এক প্রতিফলন বিশেষ। সগুণ ব্রহ্মের ন্যায় মানুষের অন্তঃকরণিক বিকাশ হয়। সগুণ ব্রহ্ম যেমন কল্পনাতরঙ্গে জগৎ সৃষ্টি করেন মানুষও তেমনি তার কল্পনাতরঙ্গে সৃষ্টি করে চলে। ভাগলপুরে বসেই কোন ব্যষ্টি মানসতরঙ্গে চৌরঙ্গীর সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার সেই কল্পনা ক্ষণভঙ্গুর , তার ব্যষ্টিমানসেই কেবল তা বাস্তব বলে অনুভূত হয় , আর সগুণ ব্রহ্মের কাল্পনিক সৃষ্টি জগৎ তাঁর কল্পনাতরঙ্গের প্রভাবে তৎসাপেক্ষ অণুসমূহের নিকট এক শাশ্বত সত্তারূপে অনুভূত হয়ে থাকে। রামের কল্পনাতরঙ্গের বিস্তৃতি তার ব্যষ্টি মানসেই সীমাবদ্ধ থাকে , তাই শ্যামের মন তাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু শ্যামের মন যদি রামের মানস পরিধির অন্তর্গত হ’ত তাহলে রামের কল্পনা - তরঙ্গ রামের ন্যায় শ্যামের নিকটও সত্য বলেই মনে হ’ত। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে মনঃবিস্তৃতির দ্বারা মানুষ অপরের মানসভূমির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে আর সেক্ষেত্রে প্রভাবাধীন ব্যষ্টিগণ তার কল্পনাকে বাস্তব বলে মনে করে। এভাবে মানুষ কল্পনা - তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে বটে কিন্তু তাঁর সেই সৃষ্টি একান্তভাবেই

পূর্বগৃহীত অনুভূতি - সাপেক্ষ। তার কাল্পনিক সৃষ্টিকে অবশ্যই সে পূর্ব হ'তে দেখেছে বা শুণেছে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বনিরপেক্ষ আর তাই তদতিরিক্ত বা তৎপূর্ব কোন কিছুর অবকাশ থাকতে পারে না যাকে তিনি তাঁর কল্পনাতরঙ্গে নকল করতে পারেন। তাই ব্রহ্মের কল্পনাতরঙ্গ মানুষের ন্যায় পূর্বগৃহীত অনুভূতি সাপেক্ষ নয়, এ হ'ল চির নোতুন। মানুষ ও ব্রহ্মের প্রধান পার্থক্য হ'ল তাদের ধর্ম বা সত্তাগত বৈশিষ্ট্য। মানুষের ধর্ম বা সত্তাগত বৈশিষ্ট্য হ'ল সাধনা করে মুক্ত পুরুষ হওয়া, আর ব্রহ্মের ধর্ম বা সত্তাগত বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁর প্রতিটি অণুকে মুক্তপুরুষ হবার প্রেরণা যোগানো। বস্তুতঃ জগৎ তথা মানুষ সৃষ্টির পশ্চাতে সগুণ ব্রহ্মের সর্বপ্রচেষ্টার মূলীভূত উদ্দেশ্য হ'ল একটিই, আর তা হ'ল তাঁর প্রতিটি অণুর মুক্তি বিধান করা।

[সূচীপত্র](#)

আমি কে বা কী ?

ক্রমবিকাশের চরম পর্যায়ে মানুষের আবির্ভাব হয় । সগুণ ব্রহ্মের মানসদেহ থেকে আহৃত তার পাঞ্চভৌতিক দেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি ব্যাপক ও পরিস্ফুট । এই পরিস্ফুট চৈতন্যের প্রতিফলনকেই বলে অণুচৈতন্য বা আত্মা , আর এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে বলা হয় মানবদেহ । অর্থাৎ মানুষের অণুচৈতন্য তথা দেহ দুই আছে । এখন দু' য়েরই বিষয়ী বলে সে নিজে এ দু' য়ের কোনটিই নয় , কেননা যদি সে আত্মা হ'ত তাহলে ‘ আমার আত্মা ’ বল্‌তে পারত না । আবার যদি সে নিজে দেহ হত তাহলে ‘ আমার দেহ ’ একথাও ৰলতে পারত না । অতএব সে আত্মা ও দেহ এ দু' য়ের অতিরিক্ত এক স্বামিত্বজ্ঞাপক সত্তা । এখন এই অতিরিক্ত সত্তাটি কী তা দেখা দরকার ।

সূক্ষ্ম আমিত্ব ৰোধ এক ভাবময় সত্তা । একটু গভীরভাবে দেখলেই ৰোঝা যায় যে অভিভাবন ক্রিয়াতেই এই ভাবময় ‘

আমি ’ - ৰোধের উৎপত্তি হয় । কর্মের ভাবনা বা কর্মের নিষ্পত্তি চৈতন্য - সাপেক্ষ , আর তাই এই ‘ আমি ’ - ৰোধও চৈতন্যাশ্রিত অর্থাৎ ‘ আমি - ৰোধ চৈতন্যেরই এক মানসাভিব্যক্তি । চৈতন্যের অভাবে অস্তিত্বৰোধ তথা তৎসাপেক্ষ ‘ আমি ’ - ৰোধের উৎপত্তি সম্ভব নয় । আত্মা , যাকে অণুচৈতন্য বা অণুপুরুষও বলা হয় তা সগুণ ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সগুণ পুরুষের ন্যায় ইনিও প্রাকৃত গুণাধীন । প্রকৃতির সত্বগুণী প্রভাবে আত্মায় অস্তিত্বৰোধ জাগে , আর এই অস্তিত্বৰোধ - সাপেক্ষে ‘ আমি ’ - র স্ফূরণ হয় । তাই বৈয়ষ্টিক ‘ আমি ’ হ’ল ভাবনাত্মক যার বিকাশ অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির সত্তগুণী প্রভাব - সাপেক্ষ । কাজেই মানুষের সত্তাবোধ বা তার ' আমি'ৰোধ আর আত্মা বা অণুচৈতন্য এক জিনিস নয় । এক টুকরো কাঠ যেমন নিজে একটা বৃক্ষ নয় কিন্তু বৃক্ষ - সাপেক্ষ ঠিক তেমনি প্রকৃতির সত্বগুণী প্রভাব - সঞ্জাত এই ‘ আমি ’ - ৰোধও নিজে আত্মা নয় কিন্তু তার অস্তিত্ব অবশ্যই আত্মা - সাপেক্ষ ।

পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে যে অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির সত্ত্বগুণী ৰন্ধনের ফলে বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় । এতে অণুচৈতন্যে অস্তিত্বৰোধ তথা ‘ আমিত্ব ' - ৰোধ জাগে । ব্যষ্টি বিশেষের ‘ আমি ’ তাই তার অণুচৈতন্য নয়– তা তার মানসভূমির অন্তর্ভুক্ত ৰুদ্ধিতত্ত্ব ।

মানুষের সত্তাৰোধ বা ‘ আমি ’ - ৰোধ ৰুদ্ধিতত্ত্বেই বিধৃত । এই ৰুদ্ধিতত্ত্ব , অহংতত্ত্ব ও চিত্তের চেয়ে সূক্ষ্ম । প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে বুদ্ধিতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির রজোগুণী বন্ধনে অহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্বের ওপর তমোগুণী ৰন্ধনে চিত্তের উদ্ভব হয় । অর্থাৎ ৰুদ্ধিতত্ত্বই প্রকৃতির রজোগুণী তথা তমোগুণী ৰন্ধনে অহংতত্ত্ব তথা চিত্তে পর্যবসিত হয় । ভূমামানস থেকে আহৃত পাঞ্চভৌতিক দেহেই আত্মার বা অণুচৈতন্যের প্রতিফলন হয়ে থাকে । অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির সত্ত্বগুণী প্রভাবে বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় , তাই ৰুদ্ধিতত্ত্ব বা আমিত্বৰোধ স্থূল দেহ সাপেক্ষ । স্থূল দেহের প্রতিটি অণু - পরমাণুতে আমিত্বৰোধ ব্যাপ্ত হয়ে থাকে বলে মানুষ তার দেহের যে - কোন অংশকেই ‘ আমি ’ বলে মনে করে ।

কিন্তু পূর্বেই বোঝানো হয়েছে যে এই ‘ আমি ’ - ৰোধ ও স্থূলদেহ সত্তাগত বিচারে এক জিনিস নয় । এই ‘ আমি ’ - ৰোধ হ’ল বুদ্ধিতত্ত্ব আর স্থূলদেহ হ’ল তারই এক আবাস বা আধার বিশেষ ।

অতএব মানুষের আমিত্ববোধ তার অণুচৈতন্যও নয় , আবার দেহও নয় । এ হ’ল অণুচৈতন্যের এক মানস অভিব্যক্তি যা বুদ্ধিতত্ত্ব নামে অভিহিত হয় ও যার অপর দু’ টি স্থূলাভিব্যক্তি হচ্ছে যথাক্রমে অহংতত্ত্ব ও চিত্ত ।

সূচীপত্র

জগৎ ও ভূমাসত্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ?

পুরুষ বা চৈতন্য প্রকৃতির ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে’ নির্গুণত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব অর্জন করে । প্রাকৃত ৰন্ধনের অধীন পরম গুণান্বিত

সত্তা সগুণ ব্রহ্মকে ভগবানও বলা হয়ে থাকে । সে বিচারে সগুণভূমির আত্মা বা অণুচৈতন্যও ভগবান পদবাচ্য । ৰন্ধনমুক্ত অণুচৈতন্য ভগবান নির্গুণব্রহ্মে লীন হয়ে পরমাস্থিতি লাভ করেন । পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে মানুষের আমিত্ববোধ তার আত্মা বা অণুচৈতন্য নয় — এটা অণুচৈতন্যের একটা স্থূলাভিব্যক্তি মাত্র । কাজেই মানুষের আমিত্বৰোধ ভগবান নয় , এ হ'ল ভগবানের এক পরিবর্তিত বা বিকৃত অবস্থা মাত্র । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে রাম বলে কোন ব্যষ্টি যখন শাহজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করে তখন তাকে শাহজাহানই বলা হয় । আসলে রাম হলেও অভিনয় করা কালে তাকে রাম বলা হয় না । ঠিক তেমনি ' আমি ' - ৰোধ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ মানুষের পরিচিতি বহন করে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মা বা ভগবান থেকে তার পৃথগস্তিত্ব থেকে যায় । সুতরাং মানুষের ' আমি ' - ৰোধই তাকে তার আত্মা বা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে । অভিনয় শেষে নাটকের শাজাহান যেমন আবার রামের ভূমিকায় নেৰে আসে , ঠিক তেমনি গুণৰন্ধনমুক্ত অণুচৈতন্য

আমিত্ব - বর্জিত হয়ে নির্গুণব্রহ্মে সমাহিত হয় । তাই মানুষের আমিত্ব - বোধই তাকে তার অণুচৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে ।

আমিত্ব - বোধ অণুচৈতন্যের স্থূলাভিব্যক্তি হলেও অণুচৈতন্য বা ভগবানের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে । সুতরাং এই ‘ আমি ’ - র কর্তৃত্ব বা অনুভূতির জন্যে অণুচৈতন্য দায়ী নয় । মঞ্চে শাজাহানের ভূমিকায় রামের অভিনয় যেমন রামের চরিত্র চিত্রণ না করে শাজাহানেরই চরিত্র - চিত্রণ করে থাকে , ঠিক তেমনি যাবতীয় কার্যে . ব্যক্ত ‘ আমি ’ র - ই কর্তৃত্ব , ফলভোগও সে - ই করে– আত্মা নিজে কিছু করেন না , ফলভোগও করেন না , তিনি কেবল দেখে যান ।

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে অণুচৈতন্য হচ্ছেন সাক্ষী - সত্তা আর কেবল সাক্ষীসত্তা হিসেবেই তিনি অনুভব্য । ‘ আমি ’ র কর্তৃত্বে অণুচৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাদের দ্বারা অণুচৈতন্য প্রভাবিত হন না । সাক্ষীসত্তা বা জ্ঞাতৃসত্তা কেবল দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন– —যাবতীয়

কার্যের কর্ত্তাও তিনি নন আর ফলভোক্তাও তিনি নন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ফুটৰল ম্যাচের দর্শকের পক্ষে খেলায় জয়লাভের কোন কৃতিত্ব নেই , খেলোয়াড়দেরই জয়ের কৃতিত্ব বা হারার গ্লানি। তবে দর্শক খেলায় জয় - পরাজয়ের সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঠিক তেমনি অণুচৈতন্য বা আত্মাও অণুমানসের যাবতীয় কার্যের তথা সুখ - দুঃখ ভোগের সাক্ষিত্ব বহন করেন।

মানুষের ‘ আমি ’ – ৰোধ হ’ল তার বুদ্ধিতত্ত্ব। এই আমি কেবল অস্তিৰোধ জাগায় কিন্তু কেবল অস্তিত্বৰোধেই তো আর কোন কার্য নিষ্পন্ন হয় না। বুদ্ধিতত্ত্বের জড়তর অভিব্যক্তি অহংতত্ত্বই কর্ম নিষ্পন্ন করে তথা কর্মফল ভোগ করে। বিশুদ্ধ ‘ আমি ’ - ৰোধের অভিমানী ৰুদ্ধিতত্ত্ব নিজে কোন কর্‌ম সম্পাদন করে না , আর তাই কর্মফলও ভোগ করে না। কিন্তু এই ৰুদ্ধিতাত্ত্বিক ‘ আমি ’ - ৰোধের অভাবে অহংতত্ত্ব কোন কর্মপ্রেরণা পায় না। ৰুদ্ধিতত্ত্বই অহংতত্ত্বকে কার্যান্বিত করায়। তাই একথাই বলতে হয় যে ৰুদ্ধিতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে কর্মসম্পন্ন না করলেও তা

হংতত্ত্বের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সে প্রতিটি কর্ম তথা কর্মফলের সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দুই জমিদারের কোন বিরোধকে কেন্দ্র করে তাদের অধীন লোকেদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে তার ফলাফলের জন্যে যেমন উভয় জমিদারই দায়ী হন , ঠিক তেমনি ব্যষ্টিবিশেষের বুদ্ধিতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য না করলেও পরোক্ষভাবে অহংতত্ত্বের যাবতীয় কার্য তথা কার্যফলের জন্যে সে - ই দায়ী থাকে।

অহংতত্ত্বের ওপর প্রকৃতির তমোগুণী ৰন্ধনে চিত্তের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অহংতত্ত্বেই নিজেকে জড়তর বিকাশ চিত্তে অভিব্যক্ত করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে চিত্ত দশ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুদ্ধিতত্ত্ব তথা অহংতত্ত্বের কার্যবাহী রূপ পরিগ্রহ করে। দৃষ্টান্ততঃ অহংতত্ত্বকে পুস্তক দর্শন ক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্যে চিত্তকে পুস্তকের রূপ পরিগ্রহণ করতে হয় , শব্দ শোণার জন্যে শব্দ হতে হয়। চিত্ত অহংতত্ত্বের স্থূলাভিব্যক্তি। অহংতত্ত্ব আবার বুদ্ধিতত্ত্বের স্থূলাভিব্যক্তি। তাই চিত্ত ৰুদ্ধিতত্ত্বেরই স্থূলতম অভিব্যক্তি। চিত্ত ৰুদ্ধিতত্ত্ব তথা অহংতত্ত্বের রূপান্তরণ বিশেষ হওয়ায় শব্দ - স্পর্শ -

রূপ - রস ও গন্ধগত তান্মাত্রিক স্পন্দন - সঞ্জাত চৈত্তিক স্ফূরণ অবশ্যই বুদ্ধিতত্ত্ব তথা অহংতত্ত্বেরই কার্যবাহী রূপভেদ মাত্র ।

ৰুদ্ধিতত্ত্ব দেয় প্রেরণা , অহংতত্ত্ব করে যায় কাজ , আর চিত্ত ওই কাজেরই ফলের রূপ ধারণ করে । বুদ্ধিতত্ত্ব , অহংতত্ত্ব ও চিত্ত এই তিনে মিলে মন । সুতরাং মনই কাজ করে আর মনই তার ফলভোগ করে । অণুচৈতন্যের স্থিতি মানসভূমির ঊর্ধ্বে , তাই তিনি কাজও করেন না , ফলও ভোগ করেন না — তিনি কেবল সাক্ষীর ভূমিকাতেই দেহে অবস্থান করেন । ব্রহ্মের স্বরূপবস্থায় অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মে পুরুষ ও তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি একে অনের প্রভাবমুক্ত কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের পুরুষ প্রকৃতির প্রভাবাধীন । পুরুষের ওপর প্রকৃতির এই প্রভুত্ব - সাপেক্ষেই জগতের উদ্ভব হয়েছে । সগুণপুরুষ প্রকৃতির সমর্থন ব্যতিরেকে কোন কাজই করতে পারেন না । পুরুষের স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রকৃতি ৰাধা দিয়ে পণ্ড করার চেষ্টা করে । চৈতন্যোদ্দীপ্ত মানুষ তার এক বন্ধনের গ্লানি থেকে অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির প্রভাবকে খর্ব করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে , আর তাই সে তার

কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধেই চালিত করে। প্রকৃতিও তার আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। সুতরাং মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার পশ্চাতেই রয়েছে প্রাকৃত বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে চৈতন্যের প্রেরণা , আর যে কর্মফল তাকে ভোগ করতে হয় তা হচ্ছে বন্ধন অটুট রাখবার জন্যে প্রকৃতি যে তৎপর হয় তারই প্রতিক্রিয়া। এখন দেখা যাক কর্ম কী করে সম্পন্ন হয় , আর কর্মের ফলই বা মানুষকে ভোগ করতে হয় কেন। যাবতীয় কর্মের সংবেদনই মনে উদ্ভূত হয় , আর মনই (অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব , অহংতত্ত্ব ও চিত্ত এ তিনের সামবায়িক সৃষ্টি) যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন করে। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে চিত্ত কৃতকর্মের তরঙ্গকে অনুবর্ত্তন করে কর্মফলের রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ কর্মতরঙ্গের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেও পরিবর্তন হতে থাকে। দৃষ্টান্ততঃ পুস্তক দেখতে হলে চিত্তকে পুস্তকে পরিণত হতে হয়। এভাবে যে - কোন কার্য করতে গেলেই সমগ্র মনকেই তার স্বাভাবিক রূপ ত্যাগ করে বিকৃত হয়ে পড়তে হয়। মনের সংরচনা তথা অস্তিত্ব পুরুষের ওপর প্রকৃতির প্রভাব - সাপেক্ষ। তাই পুরুষ কর্মপ্রেরণা

দিয়ে মনের স্বাভাবিক গতিকে ঘুরিয়ে দিক — এটা প্রকৃতির অভিপ্রেত নয় । মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় প্রত্যেক কর্মের জন্যেই প্রকৃতি এক প্রতিকর্মের সৃষ্টি করে মনকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যায় । একেই কর্মফল বলে । সুতরাং বিকৃত মনের স্বরূপবস্থায় ফিরে যাওয়ার মাধ্যমকেই কর্মফল বলা যেতে পারে ।

বিকৃত মন কর্মের প্রতিক্রিয়া ভোগ করে বা কর্মফল ভোগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় । কর্মের যে গতি বা ছন্দে মন বিকৃত হয় প্রতিকর্ম বা কর্মফলও সেই গতি বা ছন্দেরই অনুবর্ত্তন করে থাকে অর্থাৎ মনোবিকৃতির কালে প্রকৃতির ওপর যতটা ধাক্কা পৌঁছেছিল মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার কালে প্রকৃতিও ঠিক ততটা ধাক্কাই দেয় । দৃষ্টান্ততঃ , রবারের একটা বলকে আঙুল দিয়ে দাবলে তাতে যে সাময়িক বিকৃতি আসে তা আঙুল সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমান ও বিপরীত গতির সৃষ্টি করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে ও আঙুল এই প্রতিক্রিয়া অনুভব করে । এস্থলে এই রবারের বলটিকে মানুষের মনের সঙ্গে আর আঙুলকে তার ‘ আমি ’ - বোধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ।

তাই বিকৃতি সৃষ্টির কালে মনের ওপর যেমন ও যতটা চাপ পড়ে , বিকৃতি অপনোদনের কালেও ঠিক তেমন ও ততটা বিরুদ্ধ চাপ পড়ে । মনকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তথা মনের কর্ত্তা ‘ আমি ’ - কে শাস্তি দেওয়া প্রকৃতির এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই প্রতিক্রিয়া ভোগের মাধ্যমে সিদ্ধ হয় । প্রকৃতির বিধান অনুসারে মনের স্বভাবই হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা । তাই মানুষকে তার ভালমন্দ যাবতীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় । দৃষ্টান্ততঃ , যদি কেউ চুরি করে কারুর মনে কষ্ট দেয় সেক্ষেত্রে এই চৌর্য ক্রিয়ার দ্বারা তার মনে বিকৃতি উৎপন্ন হয় । এই বিকৃত মন স্বরূপাবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা অবশ্যই করবে , আর তার ফলস্বরূপ মানস স্তরে ওই ব্যষ্টিকে সমপরিমাণ কষ্ট ভোগ করতে হবে । অনুরূপভাবে যদি কেউ তার কৃতকর্মের দ্বারা অপরের মনে আনন্দ দিয়ে থাকে তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মে মনের স্বরূপাবস্থায় ফিরে যাবার কালে সেও তার মানস - স্তরে সমপরিমাণ সুখানুভব করৰে । এভাবে প্রকৃতি মানুষের মানসস্তরে যাবতীয় তৎকৃত ভালমন্দ কর্মের

প্রতিক্রিয়ার সংবেদন জাগায় ও তাকে দিয়ে তা ’ ভোগ করিয়ে নেয় ।

কেউই কোন না কোন কাজ না করে থাকতে পারে না । চুপচাপ বসে থাকাকালেও কাজ হয়ে চলেছে । শরীর হয়তো কোন কাজ করছে না কিন্তু স্বভাব চঞ্চল মন তখনও চুপ করে থাকে না । দেহ - সঞ্চালন না করেও মন চিন্তা বা কল্পনায় প্রবৃত্ত হতে পারে । এই চিন্তায় বা কল্পনায় সু বা কু দু’ - ই হতে পারে । কিন্তু এগুলো সবই ক্রিয়া , আর এজন্যে দেহ - সঞ্চালনের কোন প্রয়োজন নেই । দৈহিক কর্মটাও আবার মানসকর্মেরই ৰহিঃপ্রকাশ মাত্র । পূর্বেই বলা হয়েছে যে যাবতীয় কর্ম মনই নিষ্পন্ন করে । দশ ইন্দ্রিয় চিত্তেরই অভিপ্রকাশ , আর এরাই মানসক্রিয়াকে স্থূলক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে । দৈহিক ও মানসিক ভেদে কর্ম দ্বিবিধ । ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে যে সকল কর্ম নিষ্পন্ন হয় তাদের দৈহিক কর্ম , আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে মন স্বয়ং যে সকল কর্ম নিষ্পন্ন করে তাদের মানস - কর্ম বলা হয় । এই উভয় প্রকার কর্মই মনে বিকৃতি আনে । মন এই বিকৃতি হতে মুক্ত হয় একটা

প্রতিকারের মাধ্যমে , আর সেই প্রতিক্রিয়াভোগ মনকে অবশ্যই করতে হয় । তাই কর্ম মানসিকই হোক আর দৈহিকই হোক , কর্মের কর্ত্রাকে কর্মফল ভোগ করতে হয় ।

চৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রতিফলন মানুষের মনে প্রাকৃত ৰন্ধনের গ্লানি জাগায় । সে এই দাসত্ব শৃঙ্খলে আৰদ্ধ থাকতে চায় না । তাই স্বাধীনভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় , আর এর ফলস্বরূপ প্রকৃতিও তাকে প্রতিক্রিয়া বা কর্মফলভোগের মাধ্যমে শাস্তি দেয় । পৃথিবীতে মানুষই কেবল পূর্ণাভিব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারী । তাই মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না । প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে স্বাধীন কর্ম বা প্রকৃতির ইচ্ছা - বিরুদ্ধ কর্মের শাস্তি বিধান করা । তাই স্বাধীনভাবে কাজ করার যাদের অধিকার নেই তারা প্রকৃতির হাতে শাস্তি পায় না । এ বিচারে দেখা যায় যে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীই কর্মফল - রূপ শাস্তি ভোগ করে না

। ভাল - মন্দ ভেদে সকল কর্মেরই প্রতিকর্ম ভোগ করতে হয় । মানুষ কর্ম না করে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারে না । তাই মৃত্যুর

পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কর্ম করে যায় I মৃত্যুর পর অপর কেউ তার এই কর্মের প্রতিকর্ম ভোগ করতে পারে না , কেননা যে কর্ম করে তাকেই প্রতিকর্ম ভোগ করতে হয় I তাহলে মৃত ব্যষ্টি যার স্থূলদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় বা আগুনে দাহ করা হয় সে কী করে কর্মফল ভোগ করবে ? পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে একথাই আলোচনা করা যাচ্ছে I

আত্মা বা অণুচৈতন্য অমর , এর কোন পরিবর্ত্তন নেই I স্থূল সূক্ষ্মাভিমুখী গতিতে ভূমা - সৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক মানবাধারে অণুচৈতন্যের পূর্ণাভিব্যক্তি ঘটে থাকে I পুরুষ ও প্রকৃতি এরা পরস্পর অবিনাভাবী ও অপৃথকসিদ্ধ সত্তা I মানবদেহস্থিত অণুচৈতন্যেও তার গুণবৈশিষ্ট্যে প্রকৃতি উপস্থিত রয়েছে আর প্রকৃতি তাতে প্রভাব আরোপ করে মনের সৃষ্টি করেছে I মন এই পুরুষ ও প্রকৃতির এক সামবায়িকি সৃষ্টি বলে মনের অস্তিত্ব পুরুষ প্রকৃতি - সাপেক্ষ I অণুচৈতন্য ও প্রকৃতি একে অন্যের অপৃথক সিদ্ধ সত্তা I তাই মন অণুচৈতন্যের সঙ্গেও থাকে I মানুষের আমিত্ববোধ মন ছাড়া আর কিছুই নয় , আর যতক্ষণ মন থাকে

ততক্ষণ আমিত্ববোধও থাকে। অণুচৈতন্য এক শাশ্বত সত্তা। তাই তৎ - সাপেক্ষ মন ও মন - সাপেক্ষ আমিত্ববোধও নস্যাৎ হয় না। এভাবে দেখা যায় যে অণুচৈতন্য যখন কোন মানবাধারে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন আমিত্ববোধ স্থূল দেহকেও প্রভাবিত করে। অণুচৈতন্য দেহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার অবিনাভাবী প্রকৃতিও দেহত্যাগ করে। প্রকৃতি - সৃষ্ট মনও স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকৃতির সঙ্গেই দেহত্যাগ করে। এর ফলস্বরূপ স্থূল দেহের মৃত্যু হয়, এতে অণুচৈতন্য ও মন তাদের আশ্রয় ত্যাগ করে মাত্র। এক্ষেত্রে এ প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় যে অণুচৈতন্য তো একই আধারের মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভূমাচৈতন্যের পানে তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানবদেহ হচ্ছে পঞ্চ মৌলিকতত্ত্ব - সমন্বিত ভূমাচৈতন্যের এক স্থূলাভিব্যক্তি। ভূমাচৈতন্যের সূক্ষ্ম থেকে স্থূলায়নের গতিপ্রবাহে পঞ্চ মৌলিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর প্রকৃতির খেয়াল অনুযায়ী এই স্থূলায়নের ধাপে ধাপে বহু অণুর সমবায়ে জড় মানবদেহের সংরচনাও ক্রমশঃ হতে থাকে। এই সংরচনাতে সূক্ষ্ম ব্যোমতত্ত্ব

ক্রমশঃ মরুতত্ত্বে , মরুতত্ত্ব ক্রমশঃ তেজস্তত্ত্বে , তেজস্তত্ত্ব ক্রমশঃ অপতত্ত্বে ও অপতত্ত্ব ক্রমশঃ জড় ক্ষিতিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে চলে। এটাই হ'ল প্রকৃতির খেয়াল , আর সৃষ্টিচক্রে ভূমাচৈতন্য এভাবেই স্থূলত্বপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই প্রাকৃত নিয়মের অনুবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে মানবদেহেরও পরিবর্তন অপরিহার্য , আর এই পরিবর্তনের জন্যেই মৃত্যুর প্রয়োজন। যদি একথা স্বীকার করে নেওয়া যায় যে অণুচৈতন্য মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত একই আধারে আধৃত থাকতে পারে , সেক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরেও কোন কোন আধার কর্ম - প্রতিকর্মচক্রে আবর্ত্তিত হতে পারত। ফলতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ তদাশ্রয়ী অণুসমূহের (অর্থাৎ জীবপক্ষীয় মন তথা চৈতন্যের) ক্রমমিকাশ রুদ্ধ হয়ে সৃষ্টিচক্রে তথা প্রাকৃত নিয়মে বিপর্যয় ঘটাতে পারত। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সৃষ্ট জগৎকে সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের অভিমুখে যেতে হবে ও কালের প্রবাহে মানুষকেও একদিন তার স্থূলদেহ ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ অসংখ্য অণুর সামবায়িক সৃষ্টি জড় মানবদেহ থেকেও একদিন পূর্ণাভাস চৈতন্য - সমন্বিত অসংখ্য মানবদেহের বিকাশ ঘটবে। অতএব মৃত্যু অপরিহার্য। সকলকেই একদিন তার স্থূলদেহ ত্যাগ

করতে হবে। মৃত্যুর অর্থ হ'ল অণুচৈতন্য তথা মন থেকে দেহের বিচ্ছেদ। প্রকৃতি - সৃষ্ট মন সর্বদাই অণুচৈতন্য সংলগ্ন থাকে। মানুষের আমিত্ববোধ মনেরই অংশবিশেষ, আর মনের সঙ্গেই তাই সংলগ্ন থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মৃত্যু হ'ল দেহ থেকে মনের বিচ্ছেদ মাত্র — মনের মৃত্যু নয়। তাই মানুষের বৈয়ষ্টিক সত্তা বা তার আমিত্বৰোধও অণুচৈতন্যের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। যে মুহূর্তে প্রকৃতি পুরুষের ওপর গুণৰন্ধন আরোপ করা থেকে বিরত হয় তথা মনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই এই 'আমি' ও নস্যাৎ হয়ে যায় অর্থাৎ বৈয়ক্তিক জীবনের লয় হয়ে যায়, আর একেই 'মুক্তি' বলা হয়।

মানুষ তার মনের সাহায্যেই কর্ম করে তথা প্রতিকর্ম ভোগ করে। মনই ইন্দ্রিয় - নিচয়ের সহায়তায় মানস - সংবেদনকে স্থূল কর্মে রূপান্তরিত করে তথা সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক প্রতিক্রিয়া ভোগ করে। মৃত্যুর অর্থ হ'ল স্থূলদেহের মৃত্যু — মনের মৃত্যু নয়। মন কেবল দেহত্যাগ করে মাত্র। মনই যাবতীয় কর্মের কর্ত্রী। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তদ্বারা কৃত কর্মসমূহের ফলভোগের

জন্যে তার সত্তা বিপর্যয় হয় না। তাই কৃতকর্মের ফলভোগ কে করে এ প্রশ্ন আর ওঠে না কর্মকর্তা মনের মৃত্যু হয় না, সে - ই কর্মফল ভোগ করে।

সূক্ষ্ম মনকে ক্রিয়া নিষ্পত্তির জন্যে স্থূল আধারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এই স্থূল আধারই হ'ল মস্তিষ্ক। এর সাহায্যেই মন কাজ করে যায়। মন ও মস্তিষ্ক এ দুয়ের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে একের অভাবে অপরের কর্মপ্রচেষ্টা রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মৃত ব্যষ্টির মস্তিষ্ক বিকৃত তথা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তাই সেখানে মনও থাকে না। আবার যখন কোন ব্যষ্টি অচেতন হয়ে পড়ে বা সংজ্ঞাহারক বস্তু প্রয়োগে তাকে সাময়িকভাবে অজ্ঞান করে দেওয়া হয় তখন তার মস্তিষ্ক সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে তদাশ্রয়ী মনও স্থূল আধারের নিষ্ক্রিয়তা নিৰন্ধন কোন কাজ করতে পারে না। এই অচেতন অবস্থা মৃত্যুর অবস্থা নয়। তাই চৈতন্য বা অণুমন এরা দেহত্যাগ করে না। এ অবস্থায় মন স্থূল আধার ত্যাগ না করলেও মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তার দরুণ নিষ্ক্রিয় থাকে। অতএব ক্রিয়া - নিষ্পত্তির জন্যে তথা কর্মফল ভোগের জন্যে মনকে

অবশ্যই মস্তিষ্কের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় । মৃত্যুর পর মন স্থূলদেহ তথা তার স্থূল আধার মস্তিষ্ক ত্যাগ করে , কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত্ত পর্যন্ত সে কোন না কোন কর্ম করেই চলেছিল যার ফলভোগ তাকে অবশ্যই করতে হবে । প্রকৃতপক্ষে এই কর্মফল ভোগের জন্যেই ও মস্তিষ্কের অভাবে এই ভোগ সম্ভব নয় বলেই মনকে নোতুন আধারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । অণুচৈতন্যের ওপর প্রাকৃত গুণৰন্ধনের ফলেই মনের উদ্ভূতি হয় , আর যেহেতু এতদুভয়ের সম্পর্ক অবিনাভাবী সেজন্যে প্রকৃতিসৃষ্ট মনের সঙ্গে অণুচৈতন্যও নোতুন আধারে আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ মন ও অণুচৈতন্য উভয়েরই পুনর্জন্ম হয় । পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলভোগের জন্যে তাদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । এভাবে দেখা যায় যে জন্ম যার হয়েছে মৃত্যু তার হবেই , আর মৃত্যুর পর অভুক্ত সংস্কারভোগের জন্যে তার পুনর্জন্মও অবশ্যম্ভাবী । অণুচৈতন্য স্থূল থেকে সূক্ষ্মাভিমুখী গতির চরমবিন্দু পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই জন্ম - মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে । অণুচৈতন্যকে অনন্তকাল ধরেও এই জন্ম - মৃত্যু চক্রে আবর্ত্তন করতে হতে পারে ।

মৃত্যুর পর স্থূল আধার মস্তিষ্কের অভাবে মনের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই পূর্বকৃত কর্মফল ভোগের জন্যে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতএব মৃত্যুর পর স্বর্গ - নরকের কল্পনা হুবহু ভুল আর শুভাশুভ কৃতকর্মের জন্যে স্বর্গ - সুখ বা নরক - যন্ত্রণা ভোগের কল্পনাও একেবারেই অবাস্তব , কেননা পুনর্জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্থূল আধার মস্তিষ্কের অভাবে সুখ - দুঃখের অনুভূতি হওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গ বা নরক বলে পৃথক কোন রাজ্য নেই। এই মর্ত্যলোকেই মানুষ তার শুভাশুভ কৃতকর্মের জন্যে স্বর্গীয় সুখ বা নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ 4 করে থাকে।

পুনর্জন্ম থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে ভূত - প্রেত বলেও কোন কিছু নেই। যুক্তিতর্কে পুনর্জন্মবাদকে মেনে নেওয়া ও কার্যতঃ ভূত - প্রেতে বিশ্বাস করা– এটা পরস্পর - বিরোধী জিনিস। পুনর্জন্মের মাধ্যমে নোতুন আধার ও মস্তিষ্ক লাভ না করা পর্যন্ত বিদেহী মনের পক্ষে কোন কাজ করা বা তার কৃতকর্মের ফলভোগ করা সম্ভব নয় বলে একথা খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই মেনে নেওয়া যায় যে পুনর্জন্ম হতেই হবে। মন

যদি মস্তিষ্কের অনুপস্থিতিতে কাজ করতে পারত তাহলে মৃত্যুর পরও সে ভূমাচৈতন্যে লীন হবার সাধনা চালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মন কখনও মস্তিষ্কের অভাবে কাজ করতে পারে না। মনের এই বিশেষ ধর্মের জন্যেই পুনর্জন্মকে অস্বীকার করার উপায় নেই , আর তাই ভূত - প্রেত ইত্যাদিও নিছক কাল্পনিক বস্তু।

মৃত্যুকালে অণুচৈতন্য ও মন স্থূল আধার ত্যাগ করে বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকা কালেও অণুচৈতন্যবস্থায় মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন মন সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অচৈতন্যাবস্থা ও মৃত্যু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথমটা হ'ল মনের সাময়িক স্তব্ধতা কিন্তু দেহত্যাগ নয় আর দ্বিতীয়টা হ'ল আরও অনেক দীর্ঘসময়ের জন্যে এতে নিষ্ক্রিয় মন দেহত্যাগ করে চলে যায়।

পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য , তাই অণুচৈতন্য স্থূলদেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি - সৃষ্ট মনও দেহত্যাগ করে অণুচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। মৃত্যুর পূর্বেকার কৃতকর্মের দরুণ মন এ অবস্থায়ও বিকৃত হয়ে থাকে। পূর্বকৃত কর্মের

প্রতিক্রিয়ারূপে সুখ বা দুঃখভোগ করেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে হয় । মৃত্যুর পর মস্তিষ্কের অভাব - নিৰন্ধন মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে , আর তাই প্রতিকর্মের সম্ভবনাযুক্ত এই মনকে সাময়িকভাবে বিকৃতাবস্থায়ই থাকতে হয় । প্রতিকর্মের সম্ভবনাকেই সংস্কার বলা হয় । মনের নিষ্ক্রিয়তায় সংস্কারের স্ফূরণ রুদ্ধ হয়ে যায় , আর তাই মস্তিষ্ক সমন্বিত নোতুন আধারে পুনর্বিকাশের সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত সংস্কার বিদেহী আত্মার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে । এভাবে দেখা যায় যে প্রতিকর্মের সম্ভাবনার সম্যক্ স্ফূরণের জন্যেই পুনর্জন্মের প্রয়োজন । এই স্ফূরণ ও কর্মফলভোগও জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায় । মৃত্যুকালে মন সঙ্কুচিত হয়ে ৰীজাত্মক অবস্থায় পরিণত হয় । একটা রবারের বলের সঙ্গে এর উপমা দেওয়া যেতে পারে । রবারের বলটিকে যদি এক ইঞ্চি দাবা যায় তাহলে তাতে যে সাময়িক বিকৃতি আসে প্রাকৃতিক নিয়মে বলটিতে সেই বিকৃতি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলে । ঠিক তেমনি জন্ম - মৃত্যুও মনকে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে দেয় । প্রতিকর্মের

মাধ্যমে বিকৃত মনও তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারত কিন্তু প্রতিকর্মভোগের পূর্বেই মৃত্যু হয়ে যাওয়ায় সেই আধারে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই অভুক্ত কর্মফল ভোগের ৰীজই বা সংস্কারই বিদেহী আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে আর এই অভুক্ত সংস্কারভোগের জন্যেই আত্মাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে নোতুন আধার যুক্ত হতে হয়।

ভাল - মন্দ নির্বিশেষে যাবতীয় কর্মই মনে এক বিকৃতি উৎপাদন করে, আর সেই বিকৃতি থেকে অব্যাহতি পাবার পথে মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে সু বা কু–ফল ভোগ অবশ্যই করতে হয়। মৃত্যুর পর মন বীজাত্মকরূপে আত্মার বিষয় - ভূমিকা গ্রহণ করে, আর এই ৰীজাত্মক মনের স্ফূরণের জন্যেই আত্মাকে উপযুক্ত আধার গ্রহণ করতে হয়। ব্যষ্টিবিশেষের ছোট - বড় প্রতিটি সুখ - দুঃখাত্মক অনুভূতির সঙ্গেই তার আহৃত সংস্কারের একটা সামঞ্জস্য থাকে। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, কোন কর্মেরই প্রতিকর্ম নির্দিষ্ট থাকে না। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, বিকৃতিমুক্ত হবার কালে মানুষকে মানস পরিমাপে তার কৃতকর্মের ৰীজাণুরূপ প্রতিক্রিয়া ভোগ

করতে হয় । দৃষ্টান্ততঃ কেউ যদি চুরি করে সেক্ষেত্রে প্রতিকর্ম হিসেবে তার সমমূল্যের জিনিসই যে অপহৃত হবে এর কোন নিশ্চিততা নেই , চৌর্যকর্মের দ্বারা অপরের মানসস্তরে যতখানি ক্লেশ সৃষ্টি করা হয়েছে অপরাধীকে মানস - পরিমাপে ঠিক ততখানি ক্লেশভোগ করতে হবে । তাই কর্মের ব্যাপারে বড় কথা হ'ল সেই কর্মের দ্বারা মানস - পরিমাপে কাকে কতখানি ক্লেশ বা আরাম দেওয়া হ'ল । কর্মের কর্ত্রাকে তার প্রতিটি কৃতকর্মের ফলভোগ ঠিক ওই হিসেবেই ক'রে যেতে হৰে – এ থেকে কারো অব্যাহতি নেই । মৃত্যুর পর অণুচৈতন্যের নোতুন আধার নির্বাচনও এই ভিত্তিতেই হয়ে থাকে অর্থাৎ অণুচৈতন্য ও তৎসংশ্লিষ্ট ৰীজাত্মক সংস্কার নির্বিচারে যে - কোন আধার গ্রহণ করতে পারে না , কেননা তাতে করে সংস্কারের স্ফূরণ ব্যাহত হয়ে পড়ে ।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে অণুচৈতন্য ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কারের জন্য কে এই আধার নির্বাচন করে । সাক্ষীসত্তা অণুচৈতন্য নিজে কোন কর্ম করতে পারেন না , আর ৰীজাত্মক মনও থাকে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় । পূর্বেই বলা হয়েছে যে , মানুষ প্রাকৃত নিয়মে প্রতিকর্ম ভোগ

করে। সুতরাং আমাদের অভুক্ত প্রতিকর্ম ভোগের ব্যাপারেও প্রকৃতিই হ'ল কারকসত্তা অর্থাৎ প্রাকৃত নিয়মেই পুনর্জন্ম হয় তথা সংস্কারের স্ফূর্ত্তি হয়। এজন্যেই বলা হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর প্রকৃতিই ৰীজানুরূপ ক্ষেত্র নির্বাচন করে। এই ক্ষেত্রনির্বাচন এক দিনেও হতে পারে, আবার এতে লক্ষ লক্ষ বৎসরও লাগতে পারে, কেননা অনুরূপ ক্ষেত্র না পেলে প্রতিকর্মের ৰীজ আধার গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই মৃত্যুর পর কবে কোথায় জন্ম হৰে একথা বলা সম্ভব নয়। এই নিখিল বিশ্বে জীববাসের সম্ভবনাযুক্ত অসংখ্য গ্রহ - নক্ষত্রের যে - কোন একটিতে অণুচৈতন্য তার উপযুক্ত আধার খুঁজে পেতে পারে। কাজেই মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতেই যে কারও জন্ম হতে হবে তারও কোন নিশ্চিততা নেই। এ পৃথিবীতে কেবল তারাই জন্মগ্রহণ করবে যাদের পূর্বকৃত কর্মের ৰীজ তদনুকূল। প্রতিকর্মভোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবার প্রত্যয়মূলক কর্মও করে চলে। পূর্বকৃত কর্মফল ভোগকে ‘ অদৃষ্ট ’ বলা হয়। পূর্বজন্মের আহৃত প্রতিকর্ম - ৰীজ অনুসারে মানুষ তার মানসস্তরে সুখ বা দুঃখ পায় তখন স্মৃতির অসম্পূর্ণতা -

নিবন্ধন তার পক্ষে এই সকল অনুভূতির কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না , আর তাই তাকে ভাগ্য বা অদৃষ্ট আখ্যা দিয়ে থাকে I মানুষ তার বিপর্যয়ের জন্যে সচরাচর ভগবানকে দোষারোপ করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতকর্মের কর্ত্রা হিসেবে সে নিজেই তার ভাগ্য বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে I এ ব্যাপারে ভগবানকে দোষারোপ করা একেবারেই অর্থহীন I

ভাগ্য বা অদৃষ্টের কর্ত্তা . বা স্রষ্টা হিসেবে মানুষকে তার পরিণামভোগ অবশ্যই করতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি সু ও কু - কর্মের জন্যে তাকেই সু ও কু–ফল ভোগ করতে হবে — এ –এইটাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান , কারও ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম নেই I

সূচীপত্র

এ জগতে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত ?

পূর্ণাভিব্যক্ত চৈতন্যের প্রভাবে মানুষ ভাল - মন্দ নির্বাচন করে স্বাধীনভাবে কর্ম করবার ক্ষমতা অর্জন করে। ভাল - মন্দ একটা আপেক্ষিক জিনিস। ভাল কী আর মন্দই বা কাকে বলে এ নিয়ে বিচার করে দেখা দরকার।

সগুণ ব্রহ্ম তাঁর প্রতিটি অণুকে তাঁরই মত মুক্ত পুরুষ করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই স্থূল থেকে সূক্ষ্মাভিমুখী গতিপ্রবাহের পর্যায়ে বহু অণুসমন্বিত চৈতন্যোদ্দীপ্ত মানুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে। সৃষ্টির ক্রমপর্যায়ে সূক্ষ্মের পানে এগিয়ে যেতে যেতে অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে মানবীয় চৈতন্যের ওপর প্রাকৃত প্রভাব পশুচৈতন্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। প্রাকৃত প্রভাবের এই ঘাটতি বা বৃদ্ধি অবশ্যই সগুণ ব্রহ্মের অনুমোদন সাপেক্ষ। এ ব্যাপারে সৃষ্টির আদিতেই প্রকৃতি ও পুরুষ সম্ভবতঃ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। অন্যথা প্রকৃতি যার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যই হ'ল পুরুষের ওপর যথাশক্তি গুণৰন্ধন আরোপ করা, সে কিছুতেই পুরুষকে তার গুণৰন্ধন

থেকে অব্যাহতি দিত না। সৃষ্টির সূক্ষ্মাভিমুখী গতিতে প্রকৃতি পুরুষের ওপর তার বন্ধন শিথিল করলেও সৃষ্টির লয় হয়ে যায় না বলে পুরুষ প্রাকৃত - বন্ধনের আওতায় থেকে যায়। এই অবস্থায় যদি কোন চৈতন্যোদ্দীপ্ত সত্তা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে তবে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মই হ'ল তাকে শাস্তি প্রদান করা। শাস্তির ফলস্বরূপ অণুচৈতন্যের সূক্ষ্মাভিমুখী গতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। চৈতন্যের প্রকাশ যেখানে পরিস্ফুট প্রকৃতির প্রভাব সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। অণুর পক্ষে যদি প্রতিফলিত চৈতন্যের ব্যাপকতা ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে সূক্ষ্মের পানে তার যাত্রা অধিকতর সুগম ও ত্বরান্বিত হয়ে পড়ে। অতএব প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ না করে সে সকল কর্মের অনুশীলনকেই উত্তম কর্ম বলা যেতে পারে। প্রাকৃত নিয়মের অনুশীলন করে অর্থাৎ প্রকৃতির নির্দেশানুরূপ কর্ম করে কর্মফল ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায় আর চৈতন্যের ব্যাপকতা সিদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রকৃতির বন্ধনীশক্তিকেই শিথিল করে দেওয়া যায়, আর এতে করে মানুষের পরমপদপ্রাপ্তিও ত্বরান্বিত হয়। এ ধরনের কর্মকেই

উত্তম কর্ম তথা বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত বিদ্যামায়া বলা হয়ে থাকে।

সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত অর্থ অনুসারে বৈরাগ্যের দ্বারা জাগতিক আসক্তি বর্জিত তপশ্চর্যাক্লিষ্ট এক কঠোর আত্মনিগ্রহমূলক পদ্ধতিকেই বোঝায় । কিন্তু যথার্থ বিচারে বৈরাগ্যের অর্থ এ নয় — এ থেকে মানুষ বস্তুর উচিত ব্যবহার শিক্ষা করে মনকে জড়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে । দৃষ্টান্ততঃ মাদক দ্রব্য শরীর তথা মন উভয়ের পক্ষেই একটা উত্তেজক বস্তু , তাই উত্তেজক হিসেবে এর ব্যবহার অবশ্যই পরিহর্তব্য কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশে রোগ - নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ঔষধ হিসেবে এর ব্যবহারে কোনই দোষ নেই । তাই একই মাদক দ্রব্য ব্যবহারের তারতম্য নিবন্ধন কোথাও উত্তেজক , আবার কোথাও বা রোগ নিরাময়মূলক । ঔষধ হিসেবে ব্যবহার মদ্যের প্রকৃত ব্যবহার , আর এতে করে মানুষ মদ্যের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে না । বস্তুর এরূপ যথার্থ ব্যবহারই বৈরাগ্য । যথার্থ ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতায় মানুষের মন বস্তুর দাসে পরিণত হয় না , বরং বস্তুর প্রতি অনাসক্তই হয় । নিঃস্পৃহতার ক্রমবৃদ্ধি বা জড়ের

প্রতি অনাসক্ত থাকার অভ্যাসে মানুষের মন সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয় । সূক্ষ্মতার বিকাশ মানেই প্রাকৃত প্রভাবের হ্রাস , আর এই প্রাকৃত প্রভাবমুক্তির ক্রমপর্যায়েই মানুষ মুক্তির পানে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় ।

ভাল - মন্দের পার্থক্য নির্ধারণ করে বিবেক । উত্তেজক বস্তু হিসেবে মদ্য ব্যবহারের কু–ফল ঔষধরূপে মদ্য ব্যবহারের সু - ফল বিচার করে বিবেক । বিবেকের সাহায্যেই মন কোন বস্তু ব্যবহারের সু - ফল ও কু–ফল বুঝতে পারে । তাই মুক্তির সহায়ক বৈরাগ্যের অনুশীলনের জন্যে বিবেকের প্রয়োজন অপরিহার্য । এভাবে আমরা দেখতে পাই যে কেবল বিবেক ও বৈরাগ্যে - সমর্থিত কর্মই সৎকর্ম বা বিদ্যামায়া ।

কুকর্ম বা অবিদ্যামায়া হ'ল এর ঠিক বিপরীত জিনিস । যে সকল কর্ম চৈতন্যের প্রতিফলনকে স্তিমিত করে দেয় তথা প্রাকৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত করে তাদের কুকর্ম বলা যেতে পারে । অণুচৈতন্যের ক্রমবিকাশের অর্থ হ'ল মনের সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের স্পষ্টতর বা ব্যাপকতর প্রতিফলন । সূক্ষ্মাভিমুখী

গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্তির প্রবৃত্তি জন্মে , আর তখনই অণুচৈতন্যের এই ক্রমবিকাশ সম্ভব। মনের জড় সম্পৃক্ততায় প্রকৃতির বন্ধন দৃঢ় হয় ও চৈতন্যের প্রকাশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় চৈতন্যের স্বাভাবিক সূক্ষ্মধর্মী গতিও অব্যাহত থাকে না , কেননা প্রকৃতি তার অনভিপ্রেত কাজের জন্যে পুরুষকে যে শাস্তি দেয় , তার জের টেনে পুনরায় অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই পুরুষের সূক্ষ্মত্ব অর্জনও তখন সাময়িকভাবে রুদ্ধই হয়ে পড়ে। জড়বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণই অবিদ্যামায়া , আর এই অবিদ্যামায়াই ষড়রিপুর তথা অষ্টপাশের স্রষ্টা। কাম - ক্রোধ - লোভ - মোহ - মদ মাৎসর্য এগুলো হ'ল ষড়রিপু , আর ঘৃণা - শঙ্কা - ভয় - লজ্জা - জুগুপ্সা কুল - শীল - মান এই ক' টি হ'ল অষ্টপাশ। রিপু মানে শত্রু , তাই ষড়রিপুর অর্থ হ'ল ছ'টি শত্রু। এরা মানুষের মনকে জড়ের দিকে আকৃষ্ট করে ও সূক্ষ্মাভিমুখী গতিকে রুদ্ধ করে দিয়ে শত্রুর ন্যায় কাজ করে , তাই এরা শত্রু। অষ্টপাশের মানে হচ্ছে অষ্ট বন্ধন। বদ্ধ অবস্থায় মানুষের চলাচলের ক্ষমতা থাকে না।

অষ্টপাশ মানুষের ওপর বন্ধনীশক্তি আরোপ করে তার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দেয়।

সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে মানুষের স্বাভাবিক গতি হ'ল সূক্ষ্মের পানে ; তাই বিদ্যামায়ার অনুশীলন করে প্রত্যেককেই তার এই স্বাভাবিক গতিকে আরও ত্বরান্বিত করে নিজেকে পরম সত্তায় লীন করে দেওয়ার পথ সুগম করতে হবে।

বিদ্যামায়া বা অবিদ্যামায়ার অনুশীলনকারীদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ , যাঁরা প্রাকৃত নিয়ম মেনে চলেন তথা অণুচৈতন্যের বিকাশ ঘটান — এরা সৎলোক। দ্বিতীয়তঃ , যাঁরা প্রাকৃত নিয়ম মেনে চলেন কিন্তু অণুচৈতন্যের বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তৃতীয়তঃ যাঁরা প্রাকৃত নিয়ম মানে না আর অণুচৈতন্যের বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে উদাসীন। চতুর্থতঃ যাঁরা প্রাকৃত নিয়ম মানে না , ওপরন্তু তাদের অণুচৈতন্যের অবনতি ঘটায়। এরা হীনের চেয়েও হীন।

মনুষ্য - সৃষ্টির পশ্চাতে সগুণ ব্রহ্মের উদ্দেশ্য হ'ল তাকে দিয়ে তাঁর চরম সূক্ষ্মত্ব - প্রাপ্তির ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলা। এতে করে অণুও পরম পদপ্রাপ্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করে যাকে তার ধর্ম বলা হয়। পরম পদে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে অণুচৈতন্যেরও সত্তালোপ ঘটাতে হবে কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃতির অনুশাসনকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, অন্যথায় সে বিঘ্ন সৃষ্টি করে প্রগতি রুদ্ধ করে দিতে পারে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লোকেরাই উত্তম লোক বা প্রকৃত মানুষ, কেননা তাঁরা তাঁদের ধর্মের অনুবর্ত্তন করে সগুণ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যপূর্ত্তির অনুকূল কাজ করেন।

পশুরাও প্রকৃতির অনুশাসন মেনে চলে কিন্তু অণুচৈতন্যের স্পষ্টতর প্রতিফলনের অভাবে তারা অণুচৈতন্যে সত্তালোপের অনুকূল কাজ করতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা কেবল প্রাকৃত অনুশাসন মেনে চলে তারা এই পশুদের চেয়ে কোন দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ নয়। এরা অভিব্যক্ত চৈতন্যের প্রতিফলনকে সার্থক করতে পারে না, তাই এদের মনুষ্য দেহধারী পশু আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা বস্তুতঃ পশুর চেয়েও হীন । পশুরা কেবল প্রকৃতির অনুশাসন মেনে চলে কেননা ততোঽধিক কোন কিছু করবার সামর্থ্য তাদের থাকে না আর এই হীন ও হীনতম লোকেরা তাদের আচরণের দ্বারা শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণই করে না , তারা অভিব্যক্ত চৈতন্যকেও স্তিমিত করে দেয় । অতএব তারা কেবল মনুষ্যদেহধারী পশুই নয়– তারা পশুরও অধম ।

পূর্ব অধ্যায়ে ৰোঝানো হয়েছে যে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফলভোগ অবশ্যই করতে হবে । এ থেকে সে কিছুতেই অব্যাহতি পেতে পারে না । এই কর্মফলভোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে মানুষ অনেক কিছুই করে থাকে । তাদের এ সকল প্রচেষ্টা কতখানি যুক্তিপূর্ণ বা সার্থক তা বিচার করে দেখা যাক্ ।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে গ্রহশান্তি বা প্রায়শ্চিত্ত করে কর্মফলভোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব । কিন্তু তাঁদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণতই ভুল , কেননা কৃতকর্মের প্রভাব থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে মনকে অবশ্যই কর্মফল

ভোগ করতে হবে– এটাই প্রকৃতির বিধান। অবশ্য প্রতিক্রিয়া ভোগের মাধ্যমে মনের এই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার গতিকে দ্রুত বা মন্থর করা যেতে পারে। যেমন, যে প্রতিক্রিয়া মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে এক মাস সময় নেবে তাকে তন্ত্রের প্রভাবে ত্বরান্বিত বা দীর্ঘায়িত করে দিয়ে এক দিনে বা এক বৎসরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোন প্রকারেই তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এক মাসের শর্তে কেউ একশত টাকা কর্জ নিয়ে যেমন পাওনাদারকে সময়ের মেয়াদ এক বৎসর বা দু'বৎসর অবধিও বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু কর্জ শোধ দেওয়া থেকে কোনক্রমেই অব্যাহতি পেতে পারে না, আবার এক মাসের খরচের টাকা যেমন একদিনেও খরচ করে দেওয়া যায় কিন্তু ঋণের অঙ্ক তাতে অপরিবর্ত্তিতই থেকে যায়, ঠিক তেমনি মানুষ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তার কৃতকর্মের ফলভোগ দ্রুতগতিতে বা মন্থরগতিতে করতে পারে বটে কিন্তু তা' থেকে অব্যাহতি কিছুতেই পেতে পারে না। কর্মফল বা কর্মের প্রতিক্রিয়াভোগ কর্ত্তাকে অবশ্যই করে যেতে হবে। তবে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোগের কালকে দীর্ঘায়িত করে দিলে ভোগের তীব্রতা

ততটা অনুভূত হয় না বলে আপাতঃদৃষ্টিতে লোকে মনে করে যে গ্রহশান্তির দ্বারাই কর্মফল ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায় । দৃষ্টান্ততঃ , কোন ব্যষ্টির অদৃষ্ট গণনা করে যদি দেখা যায় যে তাকে হাতভাঙার মানসিক ক্লেশ ভোগ করতে হবে তাহলে গ্রহশান্তির দ্বারা সেই হাতভাঙা থেকে সে রেহাই পেতে পারে বটে বা ছোট ছোট দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে এই ভোগটাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে বটে কিন্তু এতে করে মানস - ক্লেশ - ভোগের মোট পরিমাণটাকে সে কিছুতেই হাল্কা করতেও পারে না অর্থাৎ মানস পরিমাপে ভোগের অঙ্ক কড়ায় - গণ্ডায় না মেটা পর্যন্ত কৃতকর্মের ফলভোগ করতেই হবে ।

গ্রহশান্তির দ্বারা কর্মফল ভোগের কালকে যেমন দীর্ঘায়িত করা যায় তেমনি ক্ষুদ্রায়তও করা যায় । দৃষ্টান্ততঃ নীলা প্রভৃতি প্রস্তর ধারণা করে মানুষ তাদের কর্মফল ভোগের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে অথবা এর প্রভাবে তারা লটারি প্রভৃতিতে পুরস্কার প্রাপ্ত হতে পারে বা কর্মস্থলে পদোন্নতিলাভ করতে পারে । এ থেকে মানুষের এই প্রত্যয় জন্মে যে গ্রহশান্তির দ্বারাই এসব ঘটে থাকে । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ’ নয় । ভাগ্য বা কৃতকর্মের ফলভোগের

মোট পরিমাণকে মানুষ কখনও বদলে দিতে বা উড়িয়ে দিতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে। যে কর্মের দ্বারা মানুষ অপরের মনে সুখাত্মক স্পন্দন জাগায় তা মানস - পরিমাপে তার সমপরিমাণ সুখের কারণ হয়। এই সুখ – ভোগের পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে না , কেবল ভোগের কালটা দীর্ঘায়িত বা ক্ষুদ্রায়িত হয়ে যেতে পারে মাত্র। গ্রহশান্তির দ্বারা ভাগ্য পরিবর্ত্তনও ঠিক এই ধরনের জিনিস। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নীলা ধারণ করে কেউ লটারিতে এক হাজার টাকা পুরস্কার পেলে একথাই বুঝতে হবে যে এই টাকা সে তার অদৃষ্ট - নির্ধারিত পাওনার অঙ্ক থেকেই পেয়েছে যা দীর্ঘকাল ধরে অনেকগুলো ছোট ছোট কিস্তিতে সে পেত। এক কিস্তিতে এত অধিক টাকা পাওয়ার ফলে বাকী সব কিস্তিতে পাবার জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তবুও এককালীন এত অধিক অর্থ পেতে দেখে মানুষের এই প্রত্যয়ই হয়ে থাকে যে গ্রহশান্তি বা নীলাধারণের প্রভাবেই অদৃষ্ট বা ভাগ্য বদলে গেছে। বস্তুতঃ ভাগ্য কখনও পরিবর্তিত হতে পারে না — ভোগের কাল কেবল পরিবর্ত্তিত হতে পারে। তাই দেখা যায় যে মুমুক্ষু আধ্যাত্মিক সাধকদের ক্ষেত্রে সুখ - দুঃখ

ভোগ খুব দ্রুতগতিতে হ'তে থাকে যাতে করে তাদের কর্মফলভোগ অতি অল্প সময়ে হয়ে যায় । মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এ জন্মেই মুক্তি চান , আর তাই প্রাকৃত - ৰন্ধনমুক্ত হবার জন্যে তাদের যাবতীয় সংস্কারভোগ এই জন্মেই তাঁরা সেরে নিতে চান । অনেকের ধারণা সৎকর্মের শুভফলের প্রভাবে কু - কর্মের কু– ফল ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব । তাদের মতে সু - কর্ম ও কু - কর্মের মোট পরিমাণ যদি সমান সমান হয় তাহলে তাদের ভোগ করবার জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না । কিন্তু এরূপ হয় না , আর এটা সম্ভবও নয় । পূর্বেই দেখা গিয়েছে যে ভাল - মন্দ নির্বিশেষে যাবতীয় কর্মই মনে একটা বিকৃতি উৎপাদন করে আর একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই মন এই বিকৃতি থেকে অব্যাহতি পায় । তাই কু- কর্মের দ্বারা যে বিকৃতি উৎপন্ন হয় তা সু - কর্মের দ্বারা দূর হতে পারে না , কেননা সু - কর্মও মনে আরেকটা নোতুন বিকৃতি উৎপাদন করে । প্রতিটি বিকৃতি অপসৃত হবার জন্যেই একটা স্বতন্ত্র বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া চাই । সুতরাং সু - কর্মের সুফল কু -

কর্মের কুফল ভোগ স্বতন্ত্রভাবেই করতে হবে — এটাই প্রকৃতির বিধান।

যুক্তিতর্কে আমরা দেখছি যে কোন কর্মের প্রতিকর্মকেই নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে আমাদের অদৃষ্টের জন্যে ভগবানকে দোষারোপ করা বা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে প্রার্থনা করা নেহাৎ বোকামি মাত্র। যে করে তাকেই প্রতিকর্ম ভোগ করতে হয়। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় — এজন্যে ভগবানকে দোষারোপ করা অজ্ঞতা বা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগুনের ধর্মই জ্বালানো আর যা কিছুই তার সংস্পর্শে আসে তা - ই জ্বলে যায়। ঠিক তেমনি প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে কর্মের প্রতিকর্ম ভোগ করতে হবে। ভগবান কোন মতেই এর জন্যে দায়ী নন, কেননা ভগবান তো কর্ম করেন নি। মানুষ নিজেই কর্ম করে, তাই সে - ই তার যাবতীয় কর্মফলের জন্যে দায়ী।

প্রার্থনা হচ্ছে কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট নিজের অনুপপত্তির কথা জানিয়ে দয়া - দাক্ষিণ্য লাভের চেষ্টা করা। যে

প্রার্থনা করে তার বিশ্বাস এই যে ভগবানের ইচ্ছা সাপেক্ষে সে তার যাবতীয় ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। তাই প্রার্থনার অর্থ ভগবানকে নিজের দৈন্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আর্থিক দৈন্যতাবশতঃ যদি কেউ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে তাহলে তার অর্থ এরকমই দাঁড়ায় যে সর্বময় কর্তা ভগবান তাকে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে তার প্রতি সুবিচার করেন নি , অতএব তিনি যেন এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করেন অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভগবানের বিচারের ওপর পক্ষপাতিত্বের দোষ আরোপ করা যা একেবারেই অনভিপ্রেত। অতএব সৈদ্ধান্তিক বিচারে প্রার্থনা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ তার কৃতকর্মের ফলভোগ করবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। ভগবানের ওপর দোষারোপ করে এ থেকে তার অব্যাহতি পাবার কোন অবকাশ নেই।

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। যতই প্রার্থনা করা যাক্ না কেন তাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচানো যায় না কেননা এ

ধরনের প্রার্থনা মঞ্জুর হবার অর্থই হ'ল আগুনকে তার সহজাত বৈশিষ্ট্য - বর্জিত অর্থাৎ দাহিকাশক্তি - বর্জিত করা অথবা হাতের সংরচনা এমন করা যাতে করে তা আগুনের দাহিকাশক্তিতে অপ্রভাবিত থেকে যায় । কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিতে কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম নেই , ক্ষুদ্র - বৃহৎ নির্বিশেষে যাবতীয় বস্তুই তার নিজ নিজ ধর্মের অনুবর্তন করে চলেছে । তাই এ জিনিস সম্ভব নয় । প্রার্থনায় প্রভাবিত হয়ে ভগবান কখনও তাঁর সৃষ্টির নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না । তাই এ উদ্দেশ্যে যদি কেউ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে তা তার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

প্রকৃতির বিধান অনুসারে সকলকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে , প্রার্থনার প্রভাবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না ।

স্তুতি হ'ল গান বা ছন্দের মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করা , একে খোশামোদীর ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া যায় না । অভীষ্টপূর্ত্তির উদ্দেশ্যে মানুষ ক্ষমতাসীন ব্যষ্টির খোশামোদী করে

থাকে। ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনের অর্থই হ'ল তাঁর খোশামোদী করা। সর্বজ্ঞ ভগবানের জন্যে ' সর্বশক্তিমান ' , ' দয়াময় ' , ' করুণাময় ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যই হ'ল ভগবান যেন তাতে খুশি হয়ে খোশামোদকারীর ওপর কিছুটা কৃপাবর্ষণ করেন , আর সর্বশক্তিমান হওয়ায় ব্যষ্টি বিশেষকে কৃতকর্মের ৰন্ধন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর অবশ্যই আছে। সুতরাং স্তুতির পশ্চাতে অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টাই প্রৰলভাবে কাজ করে , আর তাই প্রার্থনার মত স্তুতিবাদের লোকও বৃথাই সময় নষ্ট করে।

প্রার্থনা ও স্তুতি অর্থাৎ ভিক্ষা ও খোশামোদীর দ্বারা মানুষ সত্যিকারের কোন কিছু লাভও করতে পারে না। ভক্তি কিন্তু তা ' নয়। এখন দেখা যাক্ , এই ' ভক্তি ' জিনিসটা কী। ' ভক্তি ' একটি সংস্কৃত শব্দ। ভজ্ + ক্তি = ভক্তি — যার অর্থ হ'ল ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে ডাকা। এটা প্রার্থনা ও স্তুতি বা খোশামোদী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। এখন এর উপযোগিতা দেখা দরকার। সগুণ ব্রহ্ম - সৃষ্ট মুমুক্ষু অণুচৈতন্যকে তার

পরমাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় । ভূমাচৈতন্যের পানে এগিয়ে যাবার একটিই মাত্র পথ , আর তা হ'ল মনেপ্রাণে তাঁকে ডেকে তাঁতে সমাহিত হয়ে যাওয়া । মানব মনের স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে লক্ষ্য বস্তুর বা বিষয়ের ভাবনা নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত তাতেই পর্যবসিত হয়ে যাওয়া । দৃষ্টান্ততঃ কেউ যদি নিজেকে অনবরত পাগল বলে ভাবতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে বাস্তবিকই পাগলে রূপান্তরিত হয় । ঠিক তেমনি অণুচৈতন্য বা বৃহতের ভাবনা নিতে নিতে একদিন বৃহতে (ভূমাচৈতন্যে) রূপান্তরিত হয়ে যায় । ভূমাসত্তায় নিজেকে লীন করবার জন্যে অণুকে ' আমি সে - ই ' এই ভাবনায় বিভোর হয়ে যেতে হবে , তবেই সে একদিন ' সে ' - ইতে রূপান্তরিত হতে পারবে । তাই ভক্তি বা ভূমাচৈতন্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে ভূমাতে প্রতিষ্ঠিত করে । কেউ কেউ বলে থাকেন এই ভক্তির ভেতর দিয়ে ভূমাতে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা বা মুমুক্ষাও তো একটা অনুগ্রহলাভের প্রচেষ্টা , আর তাই ভক্তিও প্রার্থনা পদবাচ্য । কিন্তু এরূপ ভাবনা অর্থহীন , কেননা মনুষ্য সৃষ্টির পশ্চাতে ভগবানের উদ্দেশ্য হ'ল তাঁর প্রতিটি অণুকে তাঁরই মত মুক্ত

পুরুষ করে তোলা তথা পরম সত্তায় বিলীন করে দেওয়া। জগতের ক্ষুদ্র - বৃহৎ প্রতিটি সৃষ্টির পশ্চাতে এই একই উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। তাই স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে কার্যান্বিত করবার জন্যে তথা মানব জন্ম সার্থক করবার জন্যে যদি কেউ ভক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তার সেই প্রচেষ্টাকে ভগবানের অনুগ্রহলাভের প্রচেষ্টা বলা যায় না , কেননা যদি সে প্রচেষ্টা নাও করে বা তদ্বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হয় , তাহলেও তাকে দু'দিন আগে হোক বা দু 'দিন পরে হোক ওই পথেরই অনুশীলন করতে হবে। তাই ভক্তি প্রার্থনা বা স্তুতি পদবাচ্য নয়। প্রার্থনা বা স্তুতি বৃথা কালক্ষেপ মাত্র , অপরপক্ষে ভক্তি হচ্ছে পরমা প্রাপ্তির একটা নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্তুতি বা প্রার্থনার প্রভাবে কর্মফল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। তাহলে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কী ? এর একমাত্র প্রতিকার হ'ল কু - কাজ থেকে বিরত থাকা কেননা কু - কাজের পরিণামস্বরূপ মানুষের ওপর প্রকৃতির বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই , এতে স্তুতি

বা প্রার্থনায় কোন ফল হয় না। তাই হাত পুড়ে যাবার কষ্ট থেকে বাঁচতে হলে আগুনে হাতই দেওয়া উচিত নয়। ঠিক তেমনি কু - কর্ম না করলে কু–ফল ভোগের আশঙ্কাও জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে সগুণ ব্রহ্মের গূঢ় উদ্দেশ্যই যখন তাঁর প্রতিটি অণুর মুক্তি বিধান করা তখন প্রতিকর্ম ভোগের প্রাকৃতিক বিধানও মানুষকে অবশ্যই সেই শাশ্বতী মুক্তির পানেই ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষকে কু - কর্ম থেকে নিবৃত্ত করে মুক্তিমার্গে আকৃষ্ট করবার মঙ্গলময় অভিপ্রায়েই ভগবান প্রতিকর্ম ভোগের এই কঠোর নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। শাস্তির মাধ্যমে ভগবান মানুষকে কু - কর্ম থেকে নিবৃত্তি হবার শিক্ষাই দেন কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতা - নিবন্ধন এই শিক্ষা গ্রহণ না করে দুর্ভোগের জন্যে ভগবানকেই দোষারোপ করে থাকে। দুর্ভোগের জন্যে ভগবানকে দোষারোপ করা অথবা দুর্ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে প্রার্থনা বা স্তুতির আশ্রয় গ্রহণ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই দুঃখ কষ্ট ভোগের ভেতর দিয়ে পরম কল্যাণময় ভগবানের অমোঘ নির্দেশনা গ্রহণ করে তথা কু - কাজ থেকে নিবৃত্ত হবার

সাধনায় তৎপর হয়ে ওঠে। তাই কু কাজ ত্যাগ করাটা হ'ল বুদ্ধিমানের কাজ।

সূচীপত্র

মানুষের লক্ষ্য কী

সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টিরহস্যের অন্তরালে তাঁর অনন্তসংখ্যক অণুর মুক্তি - কামনাই প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। সূক্ষ্ম অণুসমূহকে বিচ্ছিন্ন করবার অভিপ্রায়েই একে জড় ক্ষিতিতত্ত্বে নেমে আসতে হয়েছে। এ থেকে একথাই বোঝা যায় যে সগুণ ব্রহ্ম এক অনন্ত জ্ঞানসত্তা যা তাঁর সূক্ষ্মত্ব - নিবন্ধন অবিভাজ্য। সৃষ্টি হ'ল এই অনন্ত জ্ঞানসত্তার কল্পনামাত্র। সৃষ্টিচক্রের গতি - প্রকৃতি থেকেও এ তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হয় যে এই কল্পনাধারা সগুণ চিত্ত থেকে ব্যুত্থিত হয়ে সগুণেই লীন হয়ে যায়, আর মানুষের স্থান হ'ল এই

কল্পনাতরঙ্গের এক প্রান্তীয় রেখায়। তাই দু'দিন আগেই হোক আর দু'দিন পরেই হোক মানুষকে এই কল্পনাতরঙ্গে লীন হতেই হবে। সগুণ ব্রহ্ম এক সূক্ষ্ম সত্তা। তাই তাঁতে লীন হয়ে যাবার পর সূক্ষ্মসত্তা রূপেও মানুষের বৈয়ষ্টিক অস্তিত্বের কোন অবকাশ থাকে না। একের অনস্তত্ব নিৰন্ধন দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই তাঁতে লীন হয়ে গিয়ে মানুষ নিজেও সগুণ ব্রহ্মই হয়ে যায়। দৃষ্টান্ততঃ এক ফোঁটা জলকে এক গ্লাস জলে মিশিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ফোঁটা তার পৃথগস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে গ্লাসের জলের সঙ্গে মিলে - মিশে এক হয়ে গিয়ে গ্লাসের জলেই পরিণত হয়। ঠিক তেমনি মানুষও পরম শাশ্বত সত্তায় লীন হয়ে তার পৃথগস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

সগুণ ব্রহ্মে অণুচৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়াটাই সৃষ্টির পরম ও চরম লক্ষ্য নয়। নির্গুণত্ব অর্জন করবার পূর্বেই অণুচৈতন্য সগুণ ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে নিজেও সগুণ ব্রহ্মই হয়ে যায়। এতে করে সগুণ ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

পরম সগুণ সত্তার ইচ্ছা হ'ল তাঁর প্রতিটি অণু নির্গুণত্ব অর্জন করুক কিন্তু অণুর সাধনাগত প্রচেষ্টায় বা ভূমামানস তরঙ্গে অণু যখন সগুণত্ব অর্জন করে তখন তাঁর এ ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । সগুণসত্তায় অণুর এই লীন হয়ে যাওয়াকে বলে মুক্তি অর্থাৎ কল্পনাতরঙ্গ বা সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি । এই মুক্তি কিন্তু প্রকৃত মুক্তি নয় কেন না কল্পনাতরঙ্গে অণুকে তার এই সূক্ষ্ম সগুণাস্থিতি থেকে পুনরায় সৃষ্টিচক্রে নেমে আসতে হয় তথা প্রকৃত মুক্তির পথ ধরে এগিয়ে চলতে হয় । তাই এই মুক্তি শাশ্বত মুক্তি নয় কেননা এতে করে ভূমার সৃষ্টিলীলার মৌলিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রকৃতির ৰন্ধন থেকে স্থায়ী মুক্তি লাভ করা যায় না ।

পরম নির্গুণ সত্তায় লীন হয়ে গিয়ে নির্গুণত্ব অর্জন করা বা প্রকৃতির ৰন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়াই হ'ল প্রকৃত মুক্তি , আর একেই বলে মোক্ষ । নির্গুণে যিনি একবার লীন হয়ে যান তাঁর ওপর প্রকৃতি আর তার বন্ধনী শক্তি আরোপ করে তাঁকে সৃষ্টিচক্রে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে না , আর এতে করে তিনি পরমপুরুষের চিরন্তন ইচ্ছাকে চরিতার্থতার পানে এগিয়ে নিয়ে

যান। তাই সগুণ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই বা মুক্তি অর্জন করাই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য আরও মহান; তার লক্ষ্য হ'ল মোক্ষ বা কৈবল্য মুক্তি।

সূচীপত্র

আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃতির বন্ধন থেকে অব্যাহতি পাবার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টাই হ'ল সাধনা বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতির বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব কি না, কারণ তা' যদি না-ই হ'ল তাহলে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে বা সাধনায় সময় নষ্ট করার কোন অর্থই হয় না।

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে পূর্বেই বোঝানো হয়েছে কী করে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর বদ্ধাবস্থা (প্রজাপতি) থেকে মুক্ত (হিরণ্যগর্ভ) হয়েছেন । তাই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সাধনাবলে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব । প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ হ'ল নির্গুণত্ব অর্জন করা , কেননা তখনই কেবল প্রকৃতির বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় । প্রজাপতি সাধনা করেই হিরণ্যগর্ভ হয়েছিলেন । তাই প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হ'ল সাধনা বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন ।

সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রতিসঞ্চরধারায় ভূমামানস থেকে আহৃত পঞ্চভূতাত্মক দেহেই অণুচৈতন্যের ব্যাপক অভিব্যক্তি হয়ে থাকে , পরে পূর্ণতর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত প্রভাবে অণুচৈতন্য মনঃসংযুক্ত হয় । প্রকৃতির সত্ত্ব , রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় মহত্তাত্ত্বিক , অহংতাত্ত্বিক ও চৈত্তিক বিকাশ ঘটায় । দশ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্তের ক্রিয়া আরও বিস্তৃত হয় অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে অণুচৈতন্য মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বে পর্যবসিত হয় । গুণবন্ধন দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে তা

ক্রমশঃ অহংতত্ত্ব ও চিত্তে রূপান্তরিত হয় ও দশ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্ত স্থূল কর্মে লিপ্ত হয় l অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির প্রভাব ক্রমপর্যায়ে ব্যাপ্ত হয় আর তাই অণুচৈতন্য ক্রমপর্যায়েই প্রকৃতির প্রভাব থেকে স্বরূপাবস্থায় ফিরে আসে l সূক্ষ্মায়নের ক্রমপর্যায়ে একে প্রথমে চিত্ত থেকে অহংতত্ত্বে , অহং থেকে মহতে আর সর্বশেষে মহৎ থেকে অণুচৈতন্যে ফিরে এসে প্রকৃতির বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হয় l এভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের তাৎপর্য হ'ল ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির গুণ - বন্ধনের আওতা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া l পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানুষ চেতনার (হুঁশ) প্রেরণাতেই সাধনা করবে l চিত্তভূমির চেতনাই হ'ল সাধনার প্রথম ক্ষেত্র l চৈত্তিভূমিতে সাধনার পরিণামস্বরূপ চিত্তধাতু অহংতত্ত্বে সমাহিত হয় l সাধনার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হ'ল অহংতত্ত্ব যার পরিণামস্বরূপ অহংতত্ত্ব প্রকৃতির রজোগুণী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মহত্তত্ত্বে সমাহিত হয় l এভাবে কেবল মহত্তত্ত্ব বা বিশুদ্ধ আমিত্ববোধই থেকে যায় l ভূমা - আমি থেকে অভিন্ন এই মহত্তাত্ত্বিক স্থিতি বা বিশুদ্ধ আমিত্ববোধই সবিকল্প সমাধি

পদবাচ্য। অতঃপর সাধনার প্রভাবে মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির সত্ত্বগুণী ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যে সমাহিত হয় অর্থাৎ চৈতন্য প্রাকৃত ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয় , আর এই অবস্থাকেই বলা হয় নির্বিকল্প সমাধি। তাই সাধনার সূত্রপাত হয় চিত্তে , অহংতত্ত্বে তা ' পরিপক্ক হয় , আর মহত্তত্ত্বে তা ' সম্যগ্ পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃত গুণৰন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করা সহজ জিনিস নয়। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে যে মানবীয় অণুচৈতন্যকে কি অণুপ্রকৃতিই গুণান্বিত করে ? —না , তা নয়। নির্গুণব্রহ্মে প্রকৃতি পুরুষকে গুণান্বিত করতে পারে না , কেননা সেখানে সে পুরুষের চেয়ে দুর্বলা। যেহেতু অনন্তা প্রকৃতি অনন্ত পুরুষকে গুণান্বিত করতে পারে না সেজন্যে অণুপ্রকৃতি অণুপুরুষকে গুণান্বিত করতে পারে না। তাই সগুণ ব্রহ্মে অণুপ্রকৃতি অণুপুরুষকে গুণান্বিত করছে এরূপ মনে করা ভুল। তাহলে অপর কোন প্রকৃতি নিশ্চয়ই পুরুষকে গুণান্বিত করছে , কেননা প্রকৃতির গুণৰন্ধন ছাড়া তো সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি হতে পারে না। তাই এরূপ মনে করা যেতে পারে যে , দু'টি অণুপ্রকৃতি অণুপুরুষকে গুণান্বিত করছে কিন্তু

এতে এ ধারণার অবকাশ থেকে যায় যে অনন্ত পুরুষকেও দু' টি অনন্তা প্রকৃতি গুণান্বিত করছে যা যুক্তিসিদ্ধ নয় । প্রকৃতি এক একক সত্তা যাকে অণু বা অংশে ভাগ করা যায় না । তাই অনন্তা প্রকৃতিই কেবল প্রতিটি অণুচৈতন্যকে গুণান্বিত করতে পারে । অনন্তা প্রকৃতি তার অনন্ত শক্তি দিয়ে অণুপুরুষকে গুণান্বিত করে , আর অণুচৈতন্যকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এই অনত্তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় — সংগ্রামে তাকে পরাস্ত করতে হয় । তাই সাধনা সহজ কাজ নয় ।

প্রকৃতি এক একক শক্তি যা সর্বদাই অস্থির , তাই তৎসাপেক্ষ সৃষ্টিও সর্বদাই পরিবর্ত্তনশীল । সৃষ্টিচক্রের যাবতীয় বিকাশই ভূমাচৈতন্যের স্থূলায়নবিশেষ , তাই সৃষ্টিচক্রের কোন পরিবর্ত্তন ভূমামানসেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন এনে দেয় অর্থাৎ ভূমামনও চঞ্চল হয় , আর তাতে করে সৃষ্টিধারায় পরিবর্ত্তন এসে পড়ে । কিন্তু সৃষ্টিধারায় এই পরিবর্ত্তন ক্রমপর্যায়েই হয়ে থাকে কেননা ভূমামনে পরিবর্তন আনতে প্রকৃতির যথেষ্ট সময় লাগে । ভূমাচৈতন্যের অনস্তত্ব নিবন্ধনই পরিবর্ত্তন ক্রমপর্যায়ে তথা

মন্থর গতিতে হয়ে থাকে। অনন্ত ভূমামনকে সম্পূর্ণ আবর্ত্তন করে তাতে কোন পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করতে সতত ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির পক্ষেও যথেষ্ট সময় লাগে। ভূমামনকে গুণান্বিত করার প্রয়াসকালে প্রকৃতি অণুমানসের ওপর তার গুণপ্রভাব বিস্তার করে , আর এতে করে অণুমানসের কর্ম - চাঞ্চল্য অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। অনন্তা প্রকৃতির পূর্ণ প্রভাবধীন চাঞ্চল্যের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সর্বজনবিদিত এই অণুমানসের চাঞ্চল্য ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তনশীলতার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। মানব - মনের এই গুণবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণতঃ প্রকৃতিরই দান।

প্রকৃতির চিরন্তন চাঞ্চল্যই তার সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলে আর এই চাঞ্চল্য অণুমানসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেই চলে। স্থান বা কাল বিশেষে এই চাঞ্চল্যের ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃত প্রভাবের তারতম্য নিবন্ধন অণুমানসের ওপর ৰন্ধন কোথাও দৃঢ় , আবার কোথাও বা শিথিল। তার প্রভাব মহত্বত্ত্বের ওপর সবচেয়ে কম , আর চিত্তের ওপর সবচেয়ে বেশি। তাই চিত্তের তুলনায় মহত্তত্ত্বে চাঞ্চল্যও খুব কম। সাধনা বা আধ্যাত্মিক

অনুশীলন অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতির প্রভাবকে শিথিল করে আর , তার সঙ্গে সঙ্গে মানস চাঞ্চল্যও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায় । মানস চাঞ্চল্যের জন্যে প্রকৃতিই দায়ী , সেজন্যে তার প্রভাব শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে মনও সাময়িকভাবে স্থির হয়ে পড়ে । কিন্তু অণুচৈতন্য প্রকৃতির প্রভাব মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানসভূমিতে এই স্থিরতা বা শান্ততা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয় ।

মনের স্থিরত্বকে দৃঢ় করা আর মনকে একাগ্র করা দু'টোই এক জিনিস । তাই অণুচৈতন্য প্রাকৃত প্রভাবমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানসিক একাগ্রতা আসা সম্ভব নয় । সাধনা বা অধ্যাত্ম - অনুশীলনের লক্ষ্যও হ'ল এই মানসিক একাগ্রতার প্রতিষ্ঠা । মানসিক একাগ্রতার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক পর্যায়েই স্থূলতম অভিব্যক্তি চিত্তকে প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে , অহংতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বকেও পর্যায়ক্রমে তাই করতে হবে । মন যা চিত্ত , অহংতত্ত্ব তথা মহত্তত্ত্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তা ক্রমান্বয়ে এ সকল থেকে প্রত্যাহৃত হ'লে পরেই একাগ্র হতে পারে । তাই মনের

একাগ্রতা সাধনা অধ্যাত্ম অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই নয় , আর এতে করে অণুচৈতন্য প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে ।

কিন্তু মনের এই একাগ্রতা মুক্তির পথে কতখানি সহায়ক তা পরিমাপ করে দেখা দরকার । ব্যক্তভূমি থেকে প্রত্যাহৃত হওয়াটা মনের একাগ্রতা — তা ' মনের লয় বা ধ্বংস নয় । অণুচৈতন্যের ওপর প্রকৃতি গুণবন্ধন আরোপ করায় মনের সৃষ্টি হয় । অতএব মন যতক্ষণ আছে প্রকৃতির প্রভাব অবশ্যই ততক্ষণ থাকবে । মনের একাগ্রতা মানেই প্রকৃতির বন্ধনমুক্তি নয়– এ কেবল মুক্তিপথের এক নির্ভরযোগ্য উপায় মাত্র । সম্পূর্ণ একাগ্র হলেও মন থাকে কিন্তু তার ওপর প্রকৃতির গুণবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে । মহত্তত্ত্বের ওপর প্রকৃতির গুণৰন্ধন খুবই কম , আর একাগ্র মনে চিত্ত তথা অহংতত্ব মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যাওয়ায় মহত্তত্ত্বই কেবল অবশিষ্ট থাকে । মনের ধ্বংস বা লয় না হওয়া পর্যন্ত মহত্তত্ত্ব বা ৰুদ্ধিতত্ব উপস্থিত থেকে যায় । মহত্তত্ত্ব হ'ল বিশুদ্ধ আমিত্ববোধের দ্যোতক । তাই মনের একাগ্রতা মোক্ষ বা মহানির্বাণ পদবাচ্য

নয়। একাগ্র মন হ'ল সবিকল্প সমাধির অবস্থা যেখানে একমাত্র ভাব হ'ল– " আমিই সেই " ।

প্রকৃতির ক্রমবর্দ্ধমান গুণৰন্ধনের ফলে সৃষ্টি সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের পথে এগিয়ে চলে । গুণৰন্ধনের দৃঢ়তা ও শিথিলতা ভেদে জড়তা ও সূক্ষ্মতা নির্ধারিত হয় । ব্যষ্টি বিশেষের মনে তাই মহত্তত্ব হ'ল সর্বাধিক সূক্ষ্ম আর চিত্ত হ'ল সর্বাধিক জড় । সাধনা বা অধ্যাত্ম - অনুশীলন মনের সাহায্যেই করতে হয় । জড়তা বা সূক্ষ্মতা প্রাকৃত প্রভাবের মাত্রাভেদেই এসে থাকে , আর গুণবন্ধনের মাত্রাল্পতা দেখা দিলেই মন আবার সূক্ষ্মের পানে ফিরে আসে । সাধারণতঃ ভূমাচিত্তের ওপর প্রকৃতির চরম প্রভাব - সাপেক্ষে সৃষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয়ের ভাবনাতেই মন সংলগ্ন হয় । চরম জড়ের ভাবনায় সংলগ্ন হওয়ায় মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব অত্যধিক হয়ে থাকে । পূর্বেই দেখা গেছে যে চৈতন্যের পূর্ণতম প্রতিফলন - সাপেক্ষেই মানবমন কর্মের ওপর স্বাধীনতা লাভ করে , আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বন্ধন এড়াবার এষণাও তার মধ্যে ক্রমশঃ স্ফূর্ত হয়ে ওঠে । তাই প্রকৃতি দুই বিপরীতধর্মী ভাবের (

শক্তির) সৃষ্টি করে যাদের মায়া বলে অভিহিত করা হয় । এরা হ'ল অবিদ্যা - মায়া আর বিদ্যামায়া । যাঁরা বিদ্যামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁদের অর্জিত স্বাধীনতাকে সার্থক করেন তাঁরা অনতিবিলম্বে পরম পদ প্রাপ্ত হন , কেননা বিদ্যামায়া মনকে সূক্ষ্মের দিকে চালনা করে , আর যাঁরা অবিদ্যামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরা সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা - তরঙ্গে কর্ম - কর্মফলচক্রে আবর্ত্তিত হ'তে থাকেন । অবিদ্যামায়া মনকে জড় - বিষয়ের পানে ছুটিয়ে নিয়ে যায় তথা জড় সংলগ্ন করে । বস্তুতঃ মনকে জাগতিক বস্তু - সম্পৃক্ত করে প্রকৃতির অধীনতাপাশে আবদ্ধ রাখার কাজে অবিদ্যামায়া যেন ৰন্ধনরজ্জুর কাজ করে । সাধনা বা অধ্যাত্ম - অনুশীলন মানুষকে প্রকৃতির অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার পানে এগিয়ে নিয়ে যায় আর এতে করে তার মন সূক্ষ্মত্ব অর্জন করে । প্রকৃতির গুণবন্ধনে শৈথিল্য এলেই মন সূক্ষ্মের পানে এগিয়ে যায় — ষড়রিপু ও অষ্টপাশ তার যাত্রার পথে তখন আর বাধার সৃষ্টি করে না । প্রাকৃত প্রভাবের শৈথিল্যে অবিদ্যামায়ার বন্ধন ও শৃঙ্খল যেমন শিথিল হয়ে যায় , ঠিক তেমনি অবিদ্যামায়ার বন্ধন বা শৃঙ্খল ছিন্‌ন হয়ে গেলে প্রকৃতির

গুণৰন্ধনও স্তিমিত হয়ে যায় । তাই অবিদ্যামায়া মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক হতে পারে না , কেননা এ কেবল মনের ওপর গুণৰন্ধন আরোপ করে ও মনকে জাগতিক বস্তু - সম্পৃক্ত করে চরম জড়ত্বের পানেই ঠেলে দেয় । মনঃসাম্যকে প্রগাঢ় করা , মনকে সুসন্নিবদ্ধ করা তথা প্রপঞ্চের প্রভাব কাটিয়ে সূক্ষ্মের পানে নিয়ে আসা এগুলোই হ'ল প্রকৃতির ৰন্ধনপাশ ছিন্ন করার উপায় । অবিদ্যাশ্রয়ীর পক্ষে এগুলোর কোনটাই করা সম্ভব নয় । মনঃসাম্যের অভাবে প্রপঞ্চ - সম্পৃক্ত মন জড়ের দাসে পরিণত হয় , আর মানস একাগ্রতা তখন সুদুর্লভ হয়ে পড়ে । এরূপ মনের পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন কাটিয়ে মোক্ষ অর্জন করা কখনই সম্ভব হয় না । তাই মোক্ষ - প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অবিদ্যামায়ার আশ্রয় অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে ।

সাধনাৰলে অণুচৈতন্য প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । প্রকৃতির প্রভাব দৃঢ় হলে পরেই চৈতন্য স্তিমিত হয়ে যায় । চৈতন্য হ'ল চরম জ্ঞান যা বোধি ও ৰুদ্ধিসংযুক্ত , তাই প্রকৃতির অধিকতর প্রভাবের অর্থই হ'ল অধিকতর অজ্ঞতার

অধীন হওয়া। আবার প্রকৃতির প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ৰোধির উন্মেষ তথা চৈতন্যের বিকাশ ঘটে থাকে। অধ্যাত্ম - অনুশীলন প্রকৃতির প্রভাবকে শিথিল বা অপসারিত করে দিয়ে মানুষকে পূর্ণ জ্ঞানের পানে — পূর্ণাভিব্যক্ত চৈতন্যের পানে নিয়ে চলে।

সাধনা হ'ল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তথা সংগ্রামে জয় লাভ করে প্রকৃতির অধীনতা থেকে অব্যাহতি লাভ করা। প্রকৃতি হ'ল এক অদ্ভুত শক্তি যা সর্বসত্তাকে , এমনকি প্রাকৃত বৈচিত্র্যকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সাধনা বা অধ্যাত্ম - অনুশীলনের অর্থ হচ্ছে এই সর্বনিয়ামক সত্তা প্রকৃতির ওপর অধিকার বিস্তার করা। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর অবিনাভাবী ও অপৃথকসিদ্ধ সত্তা। সংগ্রামের পূর্বে যে প্রকৃতি পুরুষের নিয়ামক , সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে গিয়ে সেই প্রকৃতি পুরুষের অধীন হয়ে যায়। এভাবে সাধনা ৰলে পুরুষ সর্ব - নিয়ামক সত্তা প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাস্ত করে তার প্রভুত্বের আসনে আরূঢ় হয়। তাই সাধনা বা

অধ্যাত্ম অনুশীলন পুরুষকে অপরিমেয় অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী করে তোলে।

সাধনায় অতিপ্রাকৃত শক্তি আয়ত্ত হয়। এই শক্তির যথার্থ ব্যবহার কী তা জানা দরকার। ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থায় অর্থাৎ নির্গুণাস্থিতিতে পুরুষ - প্রকৃতি দুইই থাকে বটে কিন্তু পুরুষ সেখানে অধিকতর ব্যক্ত , আর প্রকৃতি সেখানে তার ওপর গুণৰন্ধন আরোপে অসমর্থা। নির্গুণের এই ক্ষীণা প্রকৃতি পুরুষের ইচ্ছামাত্রেই বহিষ্কৃতা হ'তে পারে , কিন্তু পুরুষ তা ' করে না। গুণবন্ধনের অনুপস্থিতিতে পুরুষে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ইচ্ছাও জাগে না। পুরুষের ওপর প্রকৃতির বন্ধনজাল বিস্তৃত হলে পরেই এ ধরনের ইচ্ছা জাগতে পারে। তাই পুরুষের দুর্বলতা সাপেক্ষেই তাঁতে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার বাসনা জাগে , আর এতে করে পুরুষ প্রকৃতির বন্ধনাধীন হয়ে পড়ে তথা প্রভুত্ব বজায় রাখতেও অসমর্থ হয়ে পড়ে। এজন্যে পুরুষ কখনও প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না। সাধনাৰলে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির ৰন্ধন পাশ থেকে অব্যাহতি লাভ করে

, আর এতে করে যে শক্তি তার করায়ত্ত হয় তাও সে ধীরে ধীরেই অর্জন করে থাকে। প্রভুত্বের লালসায় এই সাধনার্জিত শক্তি - প্রয়োগের অর্থই হ'ল পুনরায় প্রকৃতির বন্ধনপাশে আবদ্ধ হওয়া। প্রকৃতির গুণৰন্ধনই শক্তি - প্রয়োগের ইচ্ছা জাগায়। তাই শক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা বা কার্যতঃ শক্তি - প্রয়োগ মানুষের বহু - আকাঙ্ক্ষিত বা বহু - কষ্টার্জিত মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় আর তাকে বিপরীত ধারায় পুনরায় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রাণাধীন করে দেয় — প্রকৃতির ৰন্ধন সে আর কাটিয়ে উঠতে পারে না।

মানুষ অপরের নিকট তার কৃতিত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যেই সাধনালব্ধ শক্তির প্রয়োগ করে। অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা মানুষ সহজেই অপরের নিকট প্রশংসাহ , শ্রদ্ধেয় , এমনকি আরাধ্যও হয়ে উঠতে পারে। সাধারণ মানুষ তাকে খুব বড় সাধক বলেও ভেবে নেয়। বিভূতি প্রদর্শনের পশ্চাতে এগুলোই হ'ল অভিপ্রায়। অপরের শ্রদ্ধা - ভক্তি আকর্ষণ করার ঈপ্সা অবিদ্যাশ্রয়ী মান ও মদ এই পাশ রিপুর কবলেই ফেলে দেয়। এমন অভিপ্রায়ে শক্তির ব্যবহার মনকে অবিদ্যাশ্রয়ী করে তোলে ,

আর এই বিদ্যামায়া মানুষকে অধঃপাতিত করে। তাই অতি - প্রাকৃত শক্তির ব্যবহার মানুষকে অবিদ্যার অধীন করে দেয় আর তার নৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে।

অনেকেই এরূপ মত সমর্থন করেন যে দুঃখ - নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে– যেমন , কঠিন ব্যাধির হাত থেকে অব্যাহতি দেবার উদ্দেশ্যে , সাধনালব্ধ শক্তি প্রয়োগ করাই ঠিক। এর পশ্চাতেও কিন্তু কোন যুক্তি নেই। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে হবে আর রোগ - শোক বা দৈব দুর্ঘটনা এগুলো কর্মফল ভোগের রকমভেদ মাত্র। ভগবান সর্বমঙ্গলময় আর তাঁর সৃষ্টি নিয়মানুসারেই মানুষকে কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয়। এই ভোগের মাধ্যমেই মানুষ অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হবার শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষকে দিয়ে তার কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়ে নেওয়ার পশ্চাতে এইটাই হ'ল ভগবানের উদ্দেশ্য। সাধনালব্ধ অতিপ্রাকৃতশক্তি ৰলে এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো কল্যাণকর নয়। কৃতকর্মের ফলভোগ অবশ্যই করতে হবে– এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া খুব বড় সাধকেরও ক্ষমতা - বহির্ভূত।

তাঁরা বড় জোর সাময়িকভাবে ভোগকে নিরুদ্ধ করে দিতে পারেন কিন্তু কর্মের কর্তাকে অবশিষ্ট কর্মফলভোগ অবশ্যই করতে হবে — দরকার হলে এজন্যে তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। আবার দুরারোগ্য ব্যাধিভোগরূপ শাস্তি মানুষকে কু - কর্মের কু–ফল সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে তার মনে মুক্তির এষণা জাগায়। কিন্তু অনেক ভ্রষ্ট ও অজ্ঞ সাধক তাদের সাধনালব্ধ অতিপ্রাকৃতশক্তির সাহায্যে মানুষকে ভোগযন্ত্রণা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি দিয়ে এই জাগৃতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে তারা আর্তের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করে থাকে।

সাধনালব্ধ শক্তির প্রয়োগকে নাস্তিকতা বলা যেতে পারে, কেননা অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে ভগবৎসৃষ্ট নিয়মের কার্যকারিত্বের ব্যতিক্রম ঘটানো আর ভগবানের সর্বশক্তিমত্তাকে অগ্রাহ্য করা কি এক জিনিস নয়? কেউ জলের ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হতে পারেন, জ্বলন্ত আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন বা অত্যাশ্চর্যভাবে কারো দুরারোগ্য রোগ সারিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এসব করতে গেলে তাঁকে অবশ্যই জলের ও আগুনের স্বাভাবিক ধর্মকে তথা প্রকৃতির কর্মফলভোগের

নিয়মকে খণ্ডন করতে হয় । নদীর জলে হাঁটতে গেলে ডুবে যায় , আগুনের সংস্পর্শে এলে তা পুড়ে যায় , ঠিক তেমনি কৃতকর্মের ফল মানুষকে ভোগ করতেই হয় । এ সকল অনিবার্য পরিণাম থেকে পালিয়ে বাঁচার অর্থই হ'ল ভগবানের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা । এটা শুধু অস্বীকার করাই নয় , ওপরন্তু সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করে দেওয়া । এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর কী হতে পারে !

ক্রিয়ামাত্রেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে , আর তা অবশ্যম্ভাবী । অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যবহারও একটা ক্রিয়া — একে নাস্তিক্য ক্রিয়া বা অপক্রিয়া বলাই ঠিক হবে । এমন কর্মের পরিণামভোগ মানুষকে অবশ্য করতে হবে , আর যে পর্যন্ত না তার যাবতীয় কর্মৰীজ বা সংস্কারভোগ নির্মূল হয়ে যাচ্ছে সে পর্যন্ত তার পক্ষে প্রকৃতির ৰন্ধন থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয় । তাই অধ্যাত্ম - সাধনাসঞ্জাত অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যবহার কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয় । এর ব্যবহার কেবল অধঃপতনকেই ডেকে আনে , তাই এ শক্তি ব্যবহারের লোভকে সযত্নে সংবরণ করতে হবে ।

সাধনাবলে মুক্তি লাভ হয় । তাই এজন্যে একটা বিশেষ কৌশল অবশ্যই থাকা দরকার । যিনি এ কৌশল জেনে নিয়েছেন কেবল তিনিই তা শেখাতে পারেন । তাই অধ্যাত্ম - সাধনা শেখার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষকের অন্বেষণ করতে হবে । অতএব অধ্যাত্ম - সাধনা শেখার জন্যে তথা মুক্তিলাভের জন্যে গুরুর প্রয়োজন কি অনস্বীকার্য নয় ? অন্যথায় কেউ আপনা থেকেই কি তা শিখতে পারে ? অপর কেউ ফটক না খুলে দিলে বা শৃঙ্খল মুক্ত না করে দিলে হস্তপদ শৃঙ্খলিত কারারুদ্ধ ব্যষ্টি তার শত চেষ্টাতেও নিজেকে কারামুক্ত করতে পারে না । ঠিক তেমনি প্রকৃতি কর্তৃক শৃঙ্খলিত ও নিক্ষিপ্ত এই সুবিস্তীর্ণ বিশ্ব - কারাগার থেকে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে মুক্তি পাওয়া কখনই সম্ভব নয় । তাছাড়া কারুর পক্ষেই কোন কলা - কৌশল নিজে নিজে সম্পূর্ণ শিখে নেওয়া সম্ভব নয় । এজন্যে সুবিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি শেখাতে পারেন বা যাঁকে অনুকরণ করা যেতে পারে । এই অত্যাবশ্যক শিক্ষককেই গুরু বলা হয় । অধ্যাত্ম - সাধনার

কৌশলও গুরুর নিকট শিখতে হয় । তাই গুরু ছাড়া মুক্তি লাভ সম্ভব নয় । মুক্তির জন্যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হ'ল গুরু ।

শৃঙ্খলিত কোন ব্যক্তি অপরকে শৃঙ্খলপাশ থেকে মুক্ত করতে পারে না । তাই মুক্ত পুরুষই কেবল গুরু হতে পারেন তথা অপরের মুক্তি অর্জনে সহায়ক হতে পারেন । প্রকৃতির গুণবন্ধনমুক্ত পুরুষই মুক্তপুরুষ । এ বিচারে পরম নির্গুণ সত্তাই কেবল মুক্ত পুরুষ পদবাচ্য । কিন্তু এই নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁর গুণরাহিত্য নিবন্ধন কখনও অপরের মুক্তির কারণ হতে পারেন না । এমনকি তাঁতে অপরের মুক্তি কামনারও অবকাশ থাকে না।

তাই যিনি সাধনাবলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়ে জনকল্যাণের সংকল্প নিয়ে পুনরায় স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রাকৃত গুণাধীন হন তথা মনুষ্যদেহ ধারণ করেন তিনিই কেবল গুরু হতে পারেন । যতদিন তিনি দেহ ধারণ করে থাকেন ততদিনই কেবল প্রাকৃত গুণাধীন থাকেন , দেহান্তে তিনি আবার পরম গুণাতীত সত্তায় লীন হয়ে যান

। পরম গুণাধীশ সত্তা বা ভগবানই মুক্ত আর তাই তিনিই গুরু অর্থাৎ গুরু আর ভগবানে কোন পার্থক্য নেই। তিনি এই পরম সগুণ সত্তা ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না — আর কিছু হতে পারে না। তাই গুরুই হচ্ছেন অবতারকল্প সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবান। সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছা হ'ল তাঁর প্রতিটি অণুকে মুক্ত করা আর এই ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই তিনি সৃষ্টি সংরচনা করেছেন। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম নিজে এক রূপরেখাহীন দৃষ্টিশ্রুতি - ভূমিবহির্ভূত সত্তা হওয়ায় মানুষকে তিনি মুক্তি অর্জনে সাহায্য করতে পারেন না। অণুর মুক্তি প্রচেষ্টায় সাহায্য করবার জন্যে এঁকে মনুষ্যাধার গ্রহণ করতে হয়। এঁর এই গৃহীত আধারকেই গুরু বলা হয়। তাই গুরু যে অবতারকল্প ভগবান এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

মুক্ত পুরুষ বা সদ্গুরু জগতে দুর্লভ কিন্তু তাহলেও সদ্গুরুর সন্ধানে পাহাড়ে পর্বতে বা গুহা - জঙ্গলে ঘুরে

বেড়াবার কোন প্রয়োজন নেই , কেন না সৃষ্টির পশ্চাতে সগুণ ব্রহ্মের মৌলিক ইচ্ছাই যখন প্রতিটি অণুর মুক্তি বিধান করা তখন মুমুক্ষু অণুকে যথাসময়ে দর্শন দিয়ে কৃতকৃতার্থ করা তাঁরই কাজ। মুমুক্ষু অণুর প্রগাঢ় এষণাকে চরিতার্থ করবার জন্যে সগুণ ব্রহ্ম সদ্গুরুবেশে উপযুক্ত সময়েই দর্শন দেন , তা না হলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত আর স্রষ্টা নিজেই সৃষ্টির ৰন্ধনের কারণ হয়ে পড়তেন। তাই সদ্গুরু সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো নিষ্প্রয়োজন — প্রয়োজন হ'ল কেবল মুক্তির জন্যে একটা প্রগাঢ় বাসনা জাগিয়ে তোলার।

এখন সদ্গুরু বিচার আমাদের কীভাবে করতে হবে তা জানা দরকার , যাতে করে অজ্ঞ জনসাধারণও তাঁকে সহজেই চিনে নিতে পারে। অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হওয়া বা তা প্রদর্শন করাই কি সদ্গুরুর বৈশিষ্ট্য ? সর্ববিভূতিসম্পন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষে সদ্গুরুরূপে স্বীকৃতি লাভের জন্যে বিভূতি - প্রদর্শনের কি কোন প্রয়োজন আছে ? পূর্বেই উক্ত হয়েছে , যে - কোন অবস্থাতেই অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যবহার মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটায় তথা তাকে অবিদ্যাশ্রয়ী করে দেয়। কিন্তু মুক্ত পুরুষ কোনক্রমেই

অবিদ্যাশ্রয়ী হতে পারেন না বা অবিদ্যামায়া কোনক্রমেই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই যিনি তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তিমত্তার দোহাই পেড়ে সাধারণ্যে শক্তি প্রয়োগের নজীর স্থাপন করে সদ্গুরু রূপে প্রতিষ্ঠার্জনে তৎপর হন তিনি প্রতারক — তিনি মুক্ত পুরুষ হতেই পারেন না। এ ধরনের খল ব্যক্তিকে সর্বদা পরিহার করে চলাই কর্ত্তব্য। অতিপ্রাকৃত শক্তিমত্তা বা তার প্রদর্শন দেখে সদ্গুরু বিচার হয় না। সদ্গুরু হলেন মুক্ত পুরুষ , প্রকৃতির প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অবিদ্যামায়া প্রকৃত ষড়রিপু (কাম - ক্রোধ - লোভ - মোহ - মদ - মাৎসর্য) ও অষ্টপাশের (ঘৃণা - শঙ্কা - ভয় লজ্জা - জুগুপ্সা - কুল - শীল - মান) ৰন্ধনজাল তাঁকে গ্রাস করতে পারে না। তিনি বিদ্যামায়াকে অবলম্বন করে সৃষ্টিচক্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেন অর্থাৎ তিনি বিবেক ও বৈরাগ্যের অনুগমন করেন। এমন ব্যপ্তিই কেবল সদ্গুরু পদবাচ্য।

সদগুরু প্রবর্তিত সাধনা পদ্ধতির অনুশীলন করে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে বটে কিন্তু সাধনা না করে কেবল সদগুরুর ওপর নির্ভর করে কখনো কাজ হয় না। বিনা সাধনায় মুক্তি অসম্ভব। তাই সাধনা সকলকেই করতে হবে। অনেকের মনেই এমন ভুল ধারণা রয়েছে যে তাঁদের নিজের কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই সদগুরুর কৃপাতেই তাঁরা মুক্ত হয়ে যাবেন। একথা অবশ্য ঠিক যে সদগুরুর কৃপা ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে নিজের চেষ্টা ব্যতিরেকেই মুক্তি পাওয়া যাবে এমন ধারণা কারো রাখা উচিত নয়। তাঁর কৃপা লাভ করতে হলে প্রথমে কৃপাই হতে হবে — অযোগ্য শিষ্যের ওপর তাঁর কৃপাবর্ষণ হতে পারে না। তাঁর কৃপার্হ হতে গেলে তাঁতে প্রত্যয় রেখে ভক্তি বিগলিত চিত্তে তদাদিষ্ট সাধনাক্রমের অনুশীলন করতে হবে — তিনিই আমার হয়ে সব করে দেবেন , এ ধারণার বশবর্তী হয়ে হাত - পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে চলবে না। আবার কেউ কেউ এমন ধারণাও পোষণ করেন যে যেহেতু তাঁরা সদ্গুরুর শিষ্য , সদ্গুরু আর্তত্রাণের কল্যাণময় ব্রত নিয়েই মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন , অতএব সন্ধ্যাকালে রাখাল যেমন

গোচারণভূমি থেকে পালের সকল গোরু খুঁজে নিয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে ঠিক তেমনি তাঁর মহাপ্রস্থানের সময় সাঙ্গ - পাঙ্গদের অবশ্যই তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । এটা একটা বিসদৃশ উপমা । সদগুরু গবাদি পশুর ন্যায় মানুষ চরাবার উদ্দেশ্যে ধরাপৃষ্ঠে আসেন না , তিনি আসেন মানুষকে নিজের ন্যায় মুক্ত করার পবিত্র সংকল্প নিয়ে । বন্ধনের গ্লানি মুছে ফেলে বহু ঈপ্সিত মুক্তির আস্বাদ পেতে হলে মানুষকে পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করে অধ্যাত্ম অনুশীলনে যত্নবান হতে হবে।

সাধনার প্রারম্ভেই অসুবিধার সৃষ্টি হয় , আর সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাধা - বিপত্তিও বাড়তে থাকে । সাধনা হচ্ছে প্রকৃতির বন্ধন থেকে অব্যাহতি পাবার প্রয়াস । প্রকৃতিসৃষ্ট মন নিজে বিকৃত হয়ে বন্ধন অব্যাহত রাখে । মুক্তির অভিপ্রায়ে মনকে বিকৃতির কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে । পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই বিকৃতি কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয় , ভোগ না করে এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয় । তাই জন্ম জন্মান্তরের আহৃত সংস্কার (

প্রতিক্রিয়া বীজ) ভোগ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিলাভ সম্ভব নয় । সাধারণতঃ মানুষ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকর্মও ভোগ করে চলে , অভুক্ত সংস্কার কিছু থেকে গেলে তার ভোগের জন্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । সাধক সংস্কার ভোগের জন্যে পুনর্জন্ম চান না । মুক্তির তাগিদে এজন্মেই তাঁরা অভুক্ত সংস্কার যথাশীঘ্র ভোগ করে নিতে চান । তাই ভোগাপবর্গসঞ্জাত দুঃখ - কষ্ট ও বাধা - বিপত্তিকে জয়ের সঙ্কেত বলেই সাদরে বরণ করতে হবে ।

সাধনার তাৎপর্য হ'ল প্রকৃতির গুণবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া । অবিদ্যামায়াও এক গুণবন্ধন , আর তাই এ থেকেও মুক্ত হতে হবে । বহুকাল ধরে কেউ ভদ্রভাবে কোন বাড়িতে বসবাস করতে থাকলে হঠাৎ বলপূর্বক তাকে উচ্ছেদ করা একটা দুরুহ ব্যাপার । সহজে কিছুতেই সে বাড়ি ছাড়বে না , —সে প্রাণপণ বাধা দেবে । তার সমস্ত ছল - বল ও কলা - কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেলে পরেই সে মালিককে বাড়ির পুনর্দখল দেবে । ঠিক তেমনই জন্ম - জন্মান্তরের আশ্রিত ও সম্পুষ্ট অবিদ্যামায়া সাধনা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যায় না — সে যথাশক্তি বাধার সৃষ্টি করে

টিকে থাকবার চেষ্টা করে। সদ্গুরু – প্রদত্ত সাধনাক্রম হ'ল অবিদ্যামায়াকে বিতাড়িত করবার একটা উপায় মাত্র। সাধনার সিদ্ধিতেই মানুষ অবিদ্যামায়ার হাত থেকে রেহাই পায়। তাই প্রকৃত সাধনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যামায়ার পক্ষ থেকে প্রবল বাধা আসতে থাকে যাতে বাধা - বিহ্বল হয়ে মানুষ সাধনা - পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অতএব সাধনা যা অবিদ্যামায়ার ওপর প্রবল আঘাত হানে বা তাকে পদানত করবার প্রয়াস করে তা ' স্বাভাবিক কারণেই অবিদ্যামায়ার জড় তমিস্রা শক্তির নিকট প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। সাধনায় বাধা - বিঘ্ন আসাটা কিন্তু অবিদ্যামায়ার পরাজয়েরই সূচনা করে। ভগবান বা সদ্গুরু কখনও সাধনায় বাধার সৃষ্টি করেন না , কেননা তাঁর ইচ্ছাই হ'ল প্রতিটি অণু যেন সাধনা করে তাঁর ন্যায় মুক্ত হতে পারে। এই বাধা - বিঘ্ন হ'ল প্রকৃতির অবিদ্যামায়া - সৃষ্ট। সাধনাস্ত্রের প্রয়োগে প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাভূত করে মুক্তিলাভ করতে হবে। ৯৭

সৃষ্টিলীলায় সগুণ ব্রহ্ম তাঁর প্রতিটি অণুকে সাধনা করে মুক্তিলাভে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে চৈতন্যোদীপ্ত মানুষের স্তরে উন্নীত করেন। অপরাপর জীবজন্তুরা অভিব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারী নয় , আর তাই সাধনা করে মুক্তিলাভের সামর্থ্যও তাদের নেই। কিন্তু অণুচৈতন্যের ব্যাপক স্ফূর্ত্তি নিৰন্ধন যে - কোন মানুষই সাধনার অধিকারী। অপর জীবজন্তুরা মানুষের স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত সাধনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

প্রত্যেক মানুষই সাধনার অধিকারী , তাই সদ্গুরুরূপে সগুণ ব্রহ্মকে সকলের কাছেই যেতে হয়। কিন্তু মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা না আনন্দমার্গ থাকায় মানুষ তার এই অধিকার দাবী করতে পারে না , আর তাই সগুণ ব্রহ্মকেও কার্যতঃ সকলের নিকট যেতে হয় না। মুক্তির এষণা প্রগাঢ় হলে পরেই মানুষ সদ্গুরু লাভ করে থাকে। তাদেরই কেবল উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে বলা যায় , আর তারাই কেবল সাধনার তথা সদ্গুরু লাভের অধিকারী।

পূর্ণাভিব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারী হওয়ায় মানুষ সদসতের পার্থক্য নিরূপণ করে তদনুরূপ চলতে পারে। মুক্তিলাভের ইচ্ছা একটা সৎকর্ম ও আর সব কর্মের ন্যায় এ কর্মও মানুষের নিজেকেই করতে হবে। তাই মুক্তির একটা প্রগাঢ় এষণা জাগানো তথা সাধনার অধিকার লাভ করা মানুষের নিজের কর্মপ্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করে। প্রকৃত আগ্রহশীল ব্যষ্টিকেই কেবল সদ্গুরু সাধনা শেখান বলে তাঁর ওপর পক্ষপাতিত্বের দোষ আরোপ করা চলে না। প্রত্যেকেই মুক্ত হোক এটা সগুণ ব্রহ্মের অভিপ্রেত হলেও পূর্ণাভিব্যক্ত চৈতন্যের সুযোগ গ্রহণ করে মুক্তির একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে সাধনার অধিকার অর্জন করা মানুষের বৈয়ষ্টিক প্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করে। মুক্তি সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই মানুষকে সদ্গুরুলাভে বঞ্চিত করে — এজন্যে ভগবানকে দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত মুক্তির জন্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে ভগবানের এই সৃষ্টি লীলার গূঢ় উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করা।

নিজের ন্যায় প্রতিটি অণুকে মুক্ত করার সদিচ্ছা নিয়েই সগুণ ব্রহ্ম এই সৃষ্টি সংরচনা করেছেন। এইটাই যখন তাঁর ইচ্ছা তখন প্রত্যেক অণুই দু'দিন আগে হোক আর দু'দিন পরে হোক মুক্ত হবেই। কিন্তু সাধনা দ্বারাই মুক্তি আসবে অর্থাৎ মুক্তিসাধনা মানুষকে করতেই হবে। বুদ্ধিমান ব্যষ্টি তাই বৃথা কালক্ষেপ না করে যথাশীঘ্র সম্ভব সাধনা শুরু করে দেন, কেননা তাঁরা জানেন যে এ ব্যাপারে কোন রকম দীর্ঘসূত্রতার অর্থই হ'ল অনর্থক নিজেকে জাগতিক দুঃখ - কষ্টে জর্জরিত করে রাখা। ক্যাম্পের অস্থায়ী বাসস্থানকে স্থায়ী বাসস্থান মনে করে তার অসুবিধাদি ভোগ করতে থাকাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই নশ্বর প্রপঞ্চাত্মক জাগতিক মোহ ত্যাগ করে শাশ্বত লক্ষ্যের পানে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সকলকেই একদিন এক লক্ষ্যে পৌঁছোতে হবে। তাই সাধনা করে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি অর্জন করা মানুষের অনিবার্য কর্তব্য।

সূচীপত্র

মানুষ সাধনাকে ভয় করে কেন ?

আধ্যাত্মিক সাধনা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য - কর্ত্তব্য হলেও কার্যক্ষেত্রে খুব কম মানুষই তা করেন। এর কারণ হ'ল মানুষ সাধারণতঃ সাধনার নামে ভয় পায় , আর তাই তা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু তাদের এই ভয় কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা দেখা দরকার।

প্রথমতঃ তাঁরা মনে করেন যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখে সাধনা করা সম্ভব নয় – এর জন্যে সংসার ত্যাগ করা দরকার। তাঁরা মনে করেন যে মুক্তি যা কেবল নৈষ্ঠিক তপশ্চারীদের দ্বারাই লভ্য তা সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এ ধরনের বিশ্বাস বা ভক্তি মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বিচার - বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁদের উপর্যুক্ত এই বিশ্বাসের সমর্থনে সংসার ত্যাগ করাতে সাধানার অনুকূলে একটিই মাত্র সুবিধা লাভ হয়ে থাকে , আর তা ' হল অবিদ্যামায়াসৃষ্ট জাগতিক মোহ ও বিপত্তি থেকে সাময়িক

অব্যাহতি পেয়ে নির্জন জীবনযাপনের কিছুটা সুযোগ। এটুকু সুবিধা থাকাতেই মানুষ সাধনার জন্যে সংসার ত্যাগ করা অনিবার্য বলে মনে করে। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে লোকালয়ের কলরব সাধনার পথে একটা বাধা , আর বনের নির্জনতা তার অনুকূল। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে অবিদ্যামায়ার তমিস্রা শক্তিই বাধা - বিঘ্নের সৃষ্টি করে। লোকালয় ত্যাগ করে কেবল বনে চলে গিয়েই মানুষ এই অবিদ্যাশক্তির কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। অবিদ্যামায়া বনেও তার সঙ্গ ছাড়বে না। লোকালয়ের কলরবের পরিবর্তে সেখানে সে (অবিদ্যামায়া) হয়তো জন্তু - জানোয়ারের বিকট গর্জনের মাধ্যমেই সাধনার বাধা - বিঘ্নের সৃষ্টি করবে।

নিজ নিজ পরিবেশে মানুষ সাধারণতঃ অভ্যস্ত হয়ে যায় আর তাতে সে অসুবিধাও বড় একটা বোধ করে না। দৃষ্টান্ততঃ , , অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়াগাঁয়ের কোন লোক কলকাতায় চৌরঙ্গীর কোন বাড়িতে এসে ট্রাম বাসের ঘড়ঘড়ানিতে রাত্রে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারে না। কিন্তু সেখানকার অভ্যস্ত লোক

সারারাত্রি দিব্যি ঘুমোবে। আবার তেমনই কলকাতার কোন লোক নির্জন গ্রামে গিয়ে একরাত্রি থাকতেও ভয় পাবে। তাই লোকালয়ের কলরবে প্রথম প্রথম সাধনায় অসুবিধা হলেও পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর আর কোন অসুবিধাই থাকে না। অতএব নির্জনতার জন্যে বনগমন করার পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

এখন দেখতে হবে বনে পালিয়ে গিয়ে মানুষ জাগতিক মোহ থেকে দূরে থাকতে পারে কি না। মোহ - ৰন্ধন অবিদ্যামায়ারই সৃষ্টি। সাধনার প্রভাবে অবিদ্যামায়ার প্রভাব খর্ব করেই এর হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। অবিদ্যামায়ার প্রভাব খর্ব না করে কেউ জাগতিক মোহ - ৰন্ধন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হয়েই মানুষ অবিদ্যামায়ার বজ্রৰন্ধন শিথিল করতে পারে– কেবল সংসার ত্যাগ করে বনে পালিয়ে গিয়ে কিছু লাভ হয় না। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে আকর্ষণের বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে আকর্ষণও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় , আর বিষয়ের উপস্থিতিতে

বা সংলগ্নতায় আকর্ষণ গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু তাহলেও জোর করে বাধ্য হয়ে বস্তু - সংলিপ্ততা ত্যাগ করতে গেলে মনে অবশ্যই আক্ষেপেরই সৃষ্টি হবে। এই আক্ষেপের মাত্রা খুব বেশী হলে তা মানসভূমিতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে যে - কোন সময়েই শারীরিক রোগ দেখা দিতে পারে বা সাধকের নৈতিক পতন ডেকে আনতে পারে। তাই সংসার জীবন ত্যাগ করে জোর করে সংসার - মোহ ত্যাগ করার চেষ্টায় কোন লাভ নেই। চারিত্রিক ও মানসিক দৃঢ়তা - বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় রত না হয়ে সংশয়মুক্ত সামান্য সুযোগ - সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করায় কোন পৌরুষ বা বীরত্ব নেই। পৌরুষ - প্রধান ব্যষ্টি জাগতিক মোহ - বন্ধনের মধ্যে থেকে তথা বীরের ন্যায় তার সম্মুখীন হয়ে ধীরে ধীরে তাকে করায়ত্ত করে নেবেন — ভয়বিহ্বল হয়ে তিনি সংসার ছেড়ে পালাবেন না। সাধনা হ'ল অবিদ্যামায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে বীরের ন্যায় শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে — শত্রুকে তোষামোদ করলে বা তার ভয়ে পালিয়ে গেলে

চলবে না। তাই জাগতিক বস্তু - সংলিপ্ততার ভয়ে সংসার ত্যাগ করার পেছনে কোন যুক্তিই নেই।

সাংসারিক দুঃখ - কষ্টের ভয়ে সংসার ত্যাগ করাও অনুরূপ অযৌক্তিক। সমাজে বসবাস করতে গেলে অর্থোপার্জন করে পরিবার পরিজনবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তাই তা' একটু কষ্টকর বটে। আবার ভাল অর্থোপার্জন না করতে পারলে রোগযন্ত্রণা তথা ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া দারিদ্র্যের জ্বালাও ভোগ করতে হয়। এ সকল কারণেই মানুষ তার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপেক্ষা করে কেবল নিজের দায়িত্বটুকু নিয়ে সংসার ত্যাগ করে বসে। কিন্তু এই পালিয়ে বাঁচার অপচেষ্টা কি পোষ্যবর্গের প্রতি ঔদাসীন্য ও কর্তব্যহীনতার গ্লানি বহন করে না? সংসার ত্যাগ করে যারা বনে পালায় তারা তাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বকে উপেক্ষা করে ঘোর স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কর্ত্তব্যহীনতা ও স্বার্থপরতা মন্দ কর্ম, তাই এর কু–ফল ভোগ না করে মুক্তি লাভ অসম্ভব। আবার সংসার ত্যাগ করেই মানুষ তার পরিত্যক্ত স্ত্রী - পুত্রের ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে

পারে না। অবিদ্যামায়ার মোহ রিপুসঞ্জাত প্রভাবে তাদের ভাবনা মনকে উদ্বেল করবে। পরিত্যক্ত পুত্র - কলত্র ও স্বজনগণের ভাবনায় প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। যাঁরা সংসার ত্যাগ করতে পারেন তাঁরা মানস ক্লেশ ও উদ্বেগকে অতিক্রম করে যান — একথা বলার অর্থ হ'ল ওই সকল ব্যষ্টি অবিদ্যামায়ার প্রভাবকেই অতিক্রম করে গেছেন , কেন না ভাবনায় ও কর্মে অবিদ্যামায়ার প্রভাবাধীন ব্যষ্টির পক্ষে মানস ক্লেশ ভোগকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাঁদের ক্ষেত্রে তো সংসারে থাকা আর বনে যাওয়া একই জিনিস। কেন না অবিদ্যামায়ার প্রভাবকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই তো মানুষ বনগমন করে। এই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধই হয়ে গেল তাহলে বনে গিয়ে কঠোর তপশ্চর্যাপূর্ণ জীবন - যাপন আর সংসারে থেকে স্বাভাবিক জীবন - যাপন — এ দু'য়ের কোনটিতেই অভিভূত হবেন না।

কেবল বস্তু - সংলিপ্ততা ত্যাগ করেই মানুষ অবিদ্যামায়ার বন্ধন পাশ ছিন্ন করতে পারে না। এজন্যে তাকে সূক্ষ্মের পানে মন সঞ্চালন করতে হবে। দূষিত ক্ষতস্থানে মাছির উপদ্রব বন্ধ

করতে হলে অনবরত মাছি তাড়ানোই তার সমাধান নয়– ক্ষত সারানোর চেষ্টা করতে হবে। সদ্গুরু নির্দিষ্ট সাধনাক্রম হ'ল এই ক্ষত সারানোর মলম। এর সাহায্যেই অবিদ্যামায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিলাভ করতে হবে। অবিদ্যামায়ার বন্ধন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক মোহ ও দুর্ভোগ আর মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তাই অবিদ্যামায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার এই একমাত্র উপায়। সাধনা সাংসারিক জীবনযাত্রার পরিপূরক হিসেবে সহজেই অনুশীলন করা যেতে পারে। অবিদ্যামায়া প্রথম প্রথম বাধা দেবে বটে কিন্তু একবার পরাস্ত হয়ে গেলে সে আর সাধনায় কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। সংসারে নানাপ্রকার সুবিধা থাকায় সংসার ত্যাগীর চেয়ে সংসারীর সাধনায় সুযোগ বেশী। আর বনে পালিয়ে গিয়ে সাংসারিক দুঃখ - কষ্ট থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সংসার জীবনে আর একটা বড় সুবিধা আছে। জনকল্যাণ যা আধ্যাত্মিক সাধনার একটা মুখ্য অঙ্গ তা সংসারে থেকেই লোকে করবার সুযোগ পায়। বনগমন করে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

শ্রদ্ধা - ভক্তি সহকারে সদ্গুরু - নির্দিষ্ট সাধনা - পদ্ধতির অনুশীলন সংসারে থেকেই করা যায় , এর জন্যে গৃহ - সংসার ত্যাগ করা নিষ্প্রয়োজন । প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যামায়ার প্রভাবও বিলুপ্ত হয়ে যায় , আর অধ্যাত্ম সাধনাই হ'ল অবিদ্যামায়াকে পদানত করার একমাত্র উপায় । তাই আধ্যাত্মিক সাধনা একটা আবশ্যিক কর্ম । সাধনার জন্যে স্থান বিচার করা অর্থাৎ এক জায়গাকে ভাল ও অনুকূল আর অন্য জায়গাকে মন্দ ও প্রতিকূল বিবেচনা করার অর্থ হ'ল ব্রহ্মকেই বিচার - বিশ্লেষণ করা । পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিটি স্থানই পরম ব্রহ্মের বিকাশ , তাই স্থানবিশেষকে ভাল - মন্দ বলতে যাওয়ার অর্থ ব্রহ্মে গুণারোপ করা । সাধনা যদি গোড়াতেই ভাল – মন্দের বিচারভিত্তিক হয় তাহলে সাধকের পক্ষে সৃষ্ট জগতের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগানো কখনই সম্ভব হবে না । ব্রহ্মের প্রতিটি স্থানই সমান , আর যে - কোন স্থানই সাধনার উপযুক্ত স্থান । সংসার ছেড়ে বনে চলে যাওয়া তাই একেবারেই যুক্তিহীন আর সংসার ছাড়ার ভয়ে সাধনা না করাও অনুরূপ যুক্তিহীন ।

ব্রহ্মচর্যের ভয়েও অনেকে সাধনাকে ভয় করে , তারা মনে করে ব্রহ্মচর্যের অর্থই হ'ল ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্রী - সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী তারা মনে করে যে এছাড়া সাধনা করা সম্ভব নয়। তাই ব্রহ্মচর্য বলতে কী বোঝায় , আর ব্রহ্মচারী বলতে কাদের বোঝানো হয় তা জানা দরকার। ব্রহ্মচর্যের অর্থ হ'ল মনের বহির্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করা তথা সম্পূর্ণরূপে তা ব্রহ্মে সমর্পণ করা। এখন মনের এই বহির্মুখী বৃত্তি কী , আর কী করেই বা তাকে অন্তর্মুখী করতে হয় তাও জানা দরকার। সৃষ্টি হ'ল প্রকৃতির প্রভাব সাপেক্ষ সূক্ষ্ম সত্তার স্থূলায়ন। স্থূল ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে মানুষ তার চতুষ্পার্শ্বস্থ যে সকল বস্তুকে অহরহঃ গ্রহণ করে চলেছে তারাই হ'ল জড় সৃষ্টি , আর মন হ'ল সৃষ্টির সূক্ষ্ম অংশ। তাই প্রকৃতির ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে মন সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশঃ জড়ে পর্যবসিত হতে থাকে। প্রাকৃত প্রভাবাধীন মনে বৃত্তির বহির্মুখী স্ফূরণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যা তাকে জড় বিষয় - সংশ্লিষ্ট করে রাখে। তাই মনের বহির্মুখী বৃত্তিসমূহকে অন্তর্মুখী করার অর্থই হ'ল মনকে প্রকৃতির

প্রভাব থেকে মুক্ত করা বা জড়ত্ব থেকে সূক্ষ্মত্বের পানে চালিত করা। ব্রহ্ম হলেন স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম , তাই মন জড় - সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকলে তা ব্রহ্মে সমর্পিত হতে পারে না। মনের গতিকে জড় থেকে সূক্ষ্মের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হলে একে ব্রহ্মে সমর্পণ করতে হবে। মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব খর্ব হলে পরেই এই সমর্পণ সম্ভব , কেন না প্রকৃতিই মনকে চতুষ্পার্শ্বস্থ জড় বিষয়ে সংলিপ্ত করে রাখে। তাই ব্রহ্মচর্যের অর্থ হ'ল মনকে প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত করা আর যাঁর মন ব্রহ্মে সমর্পিত হয়ে তল্লীন হয়ে যায় তিনিই হলেন ব্রহ্মচারী। তাঁর মন জড়াকৃষ্ট না হয়ে ' সূক্ষ্মে সন্নিবিষ্ট হয় ও সদা সর্বদা ব্রহ্মে বিচরণ করে। সাধনার দ্বারাই কেবল এ অবস্থা লাভ করা সম্ভব অর্থাৎ সাধনার প্রভাবে প্রকৃতির ৰন্ধনকে শিথিল করে তথা মনকে ব্রহ্মে সমর্পণ করেই কেবল মানুষ ব্রহ্মচারী হতে পারেন। লৌকিক বিচারে কাম - রিপু জয় করাকেই ব্রহ্মচর্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ষড়রিপু ও অষ্টপাশের প্রত্যেকটির গতিই বহির্মুখী। এই চতুর্দশ পাশ - রিপুর মধ্যে কেবল এক কাম - রিপুকে বশ করেই কেহ ব্রহ্মচর্য

পালন করতে পারেন না। এই ষড়রিপু ও অষ্টপাশ সমন্বিত অবিদ্যামায়ার বজ্রবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই কেবল মানুষ ব্রহ্মচারী হতে পারেন। অবিদ্যামায়ার বন্ধন এমনই দৃঢ় যে আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়া কিছুতেই তাকে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক সাধনা না করে যাঁরা তা করতে যান তাঁরা তাঁদের সময় বৃথাই নষ্ট করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা মনকে জড় থেকে সূক্ষ্মের দিকে সঞ্চালিত করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। ষড়রিপু ও অষ্টপাশের বহির্মুখী গতি তখন ধীরে ধীরে নিজে থেকেই স্তিমিত হতে থাকবে। তাদের প্রভাব নির্মূল হয়ে গেলে মন আর মোটেই জড় - সংলিপ্ত থাকবে না। তাই আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করার উদ্দেশ্যে যৌন - সংসর্গ ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। জাগতিক বস্তুসমূহের প্রতি কাম ও মোহরিপু সঞ্জাত আসক্তিই মানুষকে যৌন সংসর্গে উৎসাহিত করে। সাধনার প্রভাবে এদের বন্ধন শিথিল হয়ে গেলে যৌন - সংসর্গের অত্যুগ্র কামনা আর মনকে উৎপীড়িত করে না — এ ব্যাপারে মানুষ তখন অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়ে। তাই

সাধনার জন্যে এতে ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সাধনা হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তথা সংগ্রামে তাকে পরাভূত করা। সাধনার্জিত শক্তি প্রকৃতির শক্তির চেয়ে অবশ্যই বেশি , আর তাই সাধনাবলে মানুষ ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অবিদ্যামায়ার ৰন্ধন যতই মজবুত হোক না কেন , সাধনার দ্বারা অবশ্যই তার মুলোৎপাটন করা যায়। তাই ব্রহ্মচারী হতে গেলে স্ত্রী সংসর্গ বর্জন করার গোঁড়ামির বদলে আধ্যাত্মিক সাধনাই হ'ল অত্যাবশ্যক জিনিস। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে ব্রহ্মচর্যের লৌকিক অর্থ বীর্যধারণ উপেক্ষার জিনিস নয়। স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুর পরিপুষ্টির জন্যে শুক্রধাতু ও বীর্যের প্রয়োজন অনিবার্য। তাই মনের দৃঢ়তার বৃদ্ধি ও ৰৌদ্ধিক বিকাশের জন্যে এদের সংরক্ষণ অপরিহার্য।

কেউ কেউ আবার মনে করেন যে , প্রথম জীবনে অর্থোপার্জন করে বৃদ্ধবয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সাধনা শুরু করা যাবে। বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়ে কর্মক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। তাই ক্ষমতা থাকতে যথেষ্ট

উপার্জন করে না রাখতে পারলে বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা সম্বন্ধে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে ; প্রথম জীবনকে তারা অর্থোপার্জনের জন্যে বরাদ্দ করে রাখে আর কর্মক্ষমতারহিত জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে এসে ভগবানের নাম জপ করে। " সাধনার জন্যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই " —এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যকে সাধনার উপযুক্ত সময় বলে মনে করে থাকে। জন্ম যার হয়েছে মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। কেহই জানে না এই মৃত্যু কার নিকট কখন এসে হাজির হবে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর পানে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক মানুষই যে বার্দ্ধক্যে পৌঁছাবে তার কোন নিশ্চিততা নেই। কিন্তু তাহলেও সকলেই জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই আধ্যাত্মিক সাধনা বার্দ্ধক্যে করবে বলে স্থির করে রাখে যখন সারা জীবনের

• ঘাত - প্রতিঘাতে ও কর্ম ক্লান্তিতে দেহ হয়ে যায় অসাড় , মন হয়ে যায় আড়ষ্ট , নোতুনকে গ্রহণ করবার সামর্থ্য হয়ে যায় লুপ্ত। সাধারণতঃ মৃত্যুর ভয়েই মানুষ বার্দ্ধক্যে ভগবানকে স্মরণ করে। সারাজীবনের কু - কীর্ত্তি তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসে , অসহায় হয়ে সে ভগবানের নিকট কৃতকর্মের পাপ থেকে তাকে বাঁচাবার

কাতর প্রার্থনা করে। তাই বার্দ্ধক্যের জীর্ণশীর্ণ দেহে ও অবসন্ন মনে সারা জীবনের সংস্কারভোগজনিত গ্লানি নিয়ে ভগবানের নাম জপ করায় কোনই ফল হয় না , কেন না দেহের অসাড়তা , বার্দ্ধক্যের রোগ - ব্যাধি , আসন্ন মৃত্যু ও বৈচিত্র্যময় পশ্চাৎ জীবনের চিন্তায় রত মন তখন কিছুতেই একাগ্র হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারে না। একটা খুব প্রচলিত প্রবাদ আছে– " কাঁচা থাকতে নুয়ে বাঁশ , পাকলে করে ট্যাস ট্যাস " অর্থাৎ নোতুন কোন কিছু প্রথম জীবনেই শুরু করতে হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

কেউ কেউ জাগতিক ভোগ - বিলাস ত্যাগ করার ভয়ে সাধনা থেকে দূরে থাকতে চায়। এই অহেতুক ভয় তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে বঞ্চিত করে রেখে দেয়। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রকৃতির তমোগুণী প্রভাবের ফলেই জাগতিক ভোগ্যবস্তুসমূহের উদ্ভব হয়েছে আর মানুষ অবিদ্যামায়ার প্রাবল্যে এদের যথার্থ বলে মনে করে এদের পানে আকৃষ্ট হয়। অধ্যাত্ম সাধনায় অবিদ্যামায়ার প্রভাব ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে

গেলে মনের গতিও সূক্ষ্মের দিকে ঘুরে যায় l জাগতিক ভোগ্যবস্তুর মোহও কেটে যায় l কাম , মোহ ও লোভ অবিদ্যামায়াশ্রয়ী এই রিপুত্রয় মানুষকে ভোগ্যবস্তুর পানে ছুটিয়ে নিয়ে যায় আর এদের প্রভাব সঙ্কুচিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভোগোন্মাদনাও হ্রাস পেতে থাকে l সাধারণতঃ জাগতিক ভোগ বিলাসে মানুষ হর্ষোৎফুল্ল হয় আর ভোগবিলাস ত্যাগ করার ভাবনায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে l কিন্তু মনের নির্লিপ্তাবস্থায় এদের ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না , কেন না এদের বিচ্ছেদে মনে তখন কোন আক্ষেপের সৃষ্টি হয় না বরং মন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে l বাঞ্ছিত বস্তু না পাওয়াতেই মনের দুঃখ বা আক্ষেপ l অনীপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তির কথা তো বুঝতেই পারা যায় না l দৃষ্টান্ততঃ মদ্যের অভাবে মদ্যপায়ীর বড় কষ্ট হয় কিন্তু মদ্যে অনাসক্ত ব্যষ্টির এতে কিছুই আসে যান না , তার মনে কষ্ট হওয়ার প্রশ্নও ওঠে না , কেননা এর জন্যে তার যে কোনপ্রকার অভাববোধই নেই ! সাধনাবলে মন সূক্ষ্মের পানে চলে যায় — জড় বিষয় ভোগ তার কাছে নীরস বলে মনে হয় , জড়ের সংসর্গও অসহনীয় হয়ে ওঠে l এ অবস্থায় জড়কে হারানোর বা জড়কে না পাওয়ার

বেদনা মনে জাগতেই পারে না। কেউ কেউ মনে করেন আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে ভোগবিলাস থেকে নিজেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে, আর এই বাধ্যবাধকতার ভয়ে তাঁরা ঘাবড়ে যান। কিন্তু এরূপ বাধ্যবাধকতায় মনকে কখনও বশে আনা যায় না কেননা জোর করে মনকে বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে শরীরের ওপর চাপ পড়বে, আর তাতে অসুখ - বিসুখ করে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। সাধনামার্গে কোথাও এই বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন নেই। সদ্গুরু - নির্দিষ্ট সাধনাক্রমের এমনই মাহাত্ম্য যে নিজের অজান্তেই মন জড়কে ভুলে সূক্ষ্মের পানে চলতে থাকে ও ধীরে ধীরে জড় - সম্পৃক্ততা হারিয়ে ফেলে। তাই ভোগবিলাস ত্যাগের ভয়ে সাধনা না করা ভ্রমমূলক এর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

বিচার - বিশ্লেষণে দেখা গেল সাধনাকে ভয় করা অমূলক। মানুষ মাত্রেরই অবশ্যকরণীয় এই সাধনাকে অহেতুক ভয়ের তাড়নায় ত্যাগ করা নিছক অজ্ঞতামাত্র। তাই ভয়বিহ্বল হয়ে কেউ যেন সাধনামার্গ ত্যাগ না করে, সাধনাবলেই মানুষকে

আত্মোপলব্ধি করতে হবে– তার ভূমা - ‘ আমি’ কে জানতে হবে।

****

[পিছনের মলাটের লেখা]

“ সদ্গুরু - প্রবর্তিত সাধনা - পদ্ধতির অনুশীলন করে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে বটে কিন্তু সাধনা না করে কেবল সদ্গুরু ওপর নির্ভর করে কখনো কাজ হয় না। বিনা সাধনায় মুক্তি অসম্ভব। তাই সাধনা সকলকেই করতে হবে।... একথা অবশ্য ঠিক যে সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে নিজের চেষ্টা ব্যতিরেকেই মুক্তি পাওয়া যাবে এমন ধারণা কারো রাখা উচিত নয়। তাঁর কৃপা লাভ করতে হলে প্রথমে কৃপার্হ হতে হবে — অযোগ্য শিষ্যের ওপর তাঁর কৃপাবর্ষণ হতে পারে না। তাঁর কৃপার্হ হতে গেলে তাঁতে

প্রত্যয় রেখে ভক্তিবিগলিতচিত্তে তদাদিষ্ট সাধনাক্রমের অনুশীলন করতে হবে।”

—শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

সমাপ্ত

***************X***************

ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী – পুরুষ, জাত পাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয়। যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী ব্যবসায় লাগানো উচিত না। আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন। যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা অনুশীলন

না করে তাহলে তার কিছুই লাভ হয় না। ঠিক তেমনি সাধনা শিখে যদি কেউ তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হবে না।

মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হল অনন্ত সুখ তথা আনন্দ লাভ করা। সাধনা'ই হলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

সূচীপত্র